সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধী স্মারক-নিধি

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

শাসনমুক্ত সমাজের মত দুরূহ বিষয় নিয়ে কোন পুস্তক রচনা করার সজ্ঞান ইচ্ছা গোড়ায় আমার মনে ছিল না। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন গান্ধী বিচার পরিষদের ভূতপূর্ব কর্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বন্ধুদাস সেন। তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে একদা এক দুর্বল মুহূর্তে কলকাতার গান্ধী বিচার পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম এবং আলোচনা করার পর থেকে এক বছর যাবৎ তাঁর কাছ থেকে নিরন্তর তাড়া খেয়ে অবশেষে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হল। সুতরাং এ পুস্তক রচনার কোন রকম কৃতিত্ব যদি কারও প্রাপ্য থাকে তবে সেই প্রাপক একান্তভাবেই বন্ধুদাস সেন মহাশয়।

ক্ষুদ্র পুস্তকের স্বল্প আয়তনের ভিতর এই রকম বিষয়ের আলোচনা করা যে কঠিন ব্যাপার, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। তা ছাড়া আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তো আছেই। এর উপর সর্বোদয় বিচারধারা কোন বাঁধা-ধরা বিষয় বা "ডগমা" (dogma) নয়; এ এক ক্রমবর্ধিষ্ণু এবং নিত্যবিকাশশীল বিচারধারা। তবু আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। জানি না কতদূর কৃতকার্য হয়েছি। আমি আমার চেষ্টার ফল বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে আপাতত খালাস।

আর একটি কথা। মৌলিক চিন্তার কোন রকম দাবি আমার নেই। আমি কেবল বিভিন্ন অগ্রণী মনীষী ও চিন্তানায়কদের বিচারধারা আমার ভৃঙ্গারে করে পরিবেশন করেছি। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং গান্ধীজী ও বিনোবাজীর মতো সর্বজনমান্য মহাপুরুষদের রচনাবলীর কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করাই বাহুল্য। কিন্তু সি. ই. এম. জোডের 'গাইড টু দি ফিলসফি অফ মর‍্যালস অ্যাণ্ড পলিটিকস', বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'রোড টু ফ্রিডম', অশোক মেহতার 'ডেমক্র্যাটিক সোশালিজম', অধ্যাপক জ্যোতিঃপ্রসাদ সুদের 'এলিমেন্টস অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স', এবং অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারীর 'হিস্টরি অফ ইউরোপীয়ান পলিটিক্যাল ফিলজফি' ইত্যাদি গ্রন্থ এবং জি. ডি. এইচ. কোল, লুই ফিসার, মিলোভান জিলাস প্রমুখ পাশ্চাত্য জ্ঞানী ও সোশালিস্ট ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠানের রচনাবলীর কাছে আমি যে প্রভূত পরিমাণে

ঋণী এ কথা ভূমিকাতেই স্বীকার না করলে অন্যায় হয়ে যাবে। সর্বোদয় দর্শনের আধুনিক তিন বিশিষ্ট ভাষ্যকার আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ, ধীরেন্দ্র মজুমদার এবং দাদা ধর্মাধিকারীর রচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদি আমাকে এ বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধির পথে কতটা সাহায্য করেছে, তা এই পুস্তকের পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলার গান্ধী স্মারক নিধির সঞ্চালক আমার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু মহাশয়ের সাহায্য ও পরামর্শের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। তাঁর বহুমূল্য উপদেশাবলী আমাকে পুস্তকটির মানোন্নয়ন কার্যে প্রভূত সাহায্য করেছে। আমার মূল পাণ্ডুলিপির আয়তন তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী বৃদ্ধি করে বহুসংখ্যক পূর্বসূরীর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। এর ফলে পুস্তকের বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল হয়েছে। পুস্তকের শেষে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ-পঞ্জী দেওয়া আছে। অধিকতর আগ্রহশীল পাঠকের কাজে লাগবে বলে শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপদেশানুসারে এটির সংকলন করেছি। বক্তব্য বিষয় এবং ভাষা—উভয় ক্ষেত্রেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বহুবিধ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই অবকাশে এঁদের ঋণ স্বীকার করে রাখি।

সাধারণ পাঠকের জন্য পুস্তকটির ভাষা আরও একটু সরল হলে ভাল হত। কিন্তু রাজনীতি-বিজ্ঞানের মত একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা সহজ ভাষায় করার জন্য রচনারীতির ভিতর যে প্রসাদগুণ আবশ্যক, আমার ভিতর তার স্বল্পতা থাকায় ইচ্ছা থাকলেও এ কার্যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারিনি বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

সর্বশেষে উল্লেখ করি যে, শাসনমুক্ত সমাজ সম্বন্ধে কোন থিসিস রচনার প্রয়াস এ নয়। বাংলার চিন্তাশীল পাঠকের মনে এই পুস্তক এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব। আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য তাই সব রকমের প্রশ্ন সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে।

শ্রমভারতী, খাদীগ্রাম,
মুঙ্গের।
গান্ধীজয়ন্তী, ১৩৬৬

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বোদয় সমাজের অন্যতম তত্ত্ববেত্তা ও রূপকার
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীচরণেষু—
যাঁর পদপ্রান্তে বসে এইটুকু শিখেছি

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

॥ ১ ॥

শাসনব্যবস্থার জন্ম ও স্বরূপ

ভূমিকা

কোনক্রমে বাঁচবার নিশ্চয়তার পর ভাল ক'রে বাঁচার তাগিদ মানুষের এক সনাতন প্রবণতা। জীব হিসাবে এই পৃথিবীতে স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়, অর্থাৎ ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা ও মহামারী এবং নানাবিধ জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্বন্ধে অল্পাধিক সুনিশ্চিত হবার পর স্বভাবতঃই মানুষ আরও ভাল ক'রে বাঁচতে চেয়েছে। এরই তাগিদে একক বিচরণকারী মানুষের পূর্বপুরুষরা (anthropoids) প্রথমে পরিবার এবং তারপর যূথ ও গোষ্ঠী ইত্যাদি গঠন করেছে। এই কারণেই সমাজ সভ্যতা ইত্যাদির গোড়াপত্তন ও বিকাশ হয়েছে এবং অবশেষে মানুষ রাষ্ট্র (state) গঠন ক'রে পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পরিচালিত করেছে। সমাজবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মানুষ যুগে যুগে তার প্রয়োজন ও বুদ্ধি অনুসারে ভাল করে বাঁচার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ যতই অপরিহার্য বোধ হ'ক, এ ব্যবস্থা শাশ্বত নয়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে এর সৃষ্টি করেছে এবং প্রয়োজন বোধ করলে এর বিলুপ্তি সাধনও করবে। মানবসভ্যতার শৈশবকালে শাসন বা বাহ্য নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য হ'লেও মানবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ শাসন ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্তির পর যথার্থ স্বতন্ত্রতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।

রাষ্ট্র ও সরকার

রাজনীতি-বিজ্ঞানের কোন বিশিষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে রাষ্ট্র ও সরকারের (Government) পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণ কথাবার্তায় যদিচ শব্দ ছুটি অনেক সময় সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবু এই ছুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের মোটামুটি চারটি আধার : (১) জনসাধারণ এবং তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, (২) অখণ্ড ভৌগোলিক সীমা, (৩) একই শাসন-ব্যবস্থার অধীনতা ও রাজনৈতিক গঠন এবং (৪) অপরাপর রাষ্ট্র থেকে সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য ও নিজ এলাকার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক এই সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে গার্নার বলেছেন, "মোটামুটি বহুব্যক্তির সমবায়, স্থায়িভাবে ভূভাগের এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসী, বাহ্য নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্ত বা প্রায় তার কাছাকাছি এবং এরূপ এক সংগঠিত সরকারের শাসনাধীন, যার প্রতি অধিকাংশ বাসিন্দা কমবেশী অনুগত"। অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বসাধারণের হিতার্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঙ্ঘবদ্ধ মানব-সমবায়। নর-নারী-শিশুনির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক এর অঙ্গীভূত। এদের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের যৌথজীবনের ভাগীদার এবং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের প্রতি কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রদ্রোহী না হ'লে সবাই এর সুযোগসুবিধা এবং কর্তব্য ও অধিকারের অংশীদার হতে পারে। পক্ষান্তরে সরকার সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র নিয়ে গঠিত হয়। গার্নারের ভাষায় বলতে গেলে, সরকার হচ্ছে "রাষ্ট্রের অভিপ্রায় পরিকল্পনা (formulate), প্রকাশ ও কার্যান্বিত করার বাহন, প্রতিষ্ঠান বা আমলাতন্ত্রের যৌথ নাম"। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সরকার হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট এক সজীব যন্ত্র।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক শব্দ নয়, সরকারের পরিধি রাষ্ট্রের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। তা ছাড়া সরকারের পরিবর্তন হ'লেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা পরিচিতির পার্থক্য হয় না।

ভারতে কংগ্রেসের পরিবর্তে অপর যে কোন দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লেও ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক চারিত্রধর্মে কোন ইতরবিশেষ হবে না। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রের ভিতর একটা স্থায়িত্ব-গুণ আছে; কিন্তু সরকারের পরিবর্তন হতে পারে। অবশ্য পররাষ্ট্রের আক্রমণ বা দুই রাষ্ট্রের সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি অসাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব-ধর্ম বজায় থাকে না।

তবে সাধারণ মানুষের কাছে এই পার্থক্যের বিশেষ কোন মূল্য নেই। কারণ রাষ্ট্রের যে সব ক্রিয়াকলাপ আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তা আসলে সরকারেরই বিধি-বিধান। রাষ্ট্রের অভিপ্রায় ব্যক্তকারী আইন-কানুন সরকার কর্তৃক রচিত ও কার্যান্বিত হয়।

রাষ্ট্রের জন্ম—ভগবদ্দত্ত অধিকারের মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ খ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে চারটি প্রধান। আমরা পর পর এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথম যুগে মনে করা হ'ত যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর-সৃষ্ট এবং রাজা এই ধরাতলে ভগবানের প্রতিনিধি। একে ভগবদ্দত্ত অধিকারের (Divine Right) মতবাদ বলা হয়। সেণ্ট পলের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এই মতবাদের পরিপুষ্টির ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেকে যেন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হয়; কারণ ঈশ্বর ছাড়া অপর কারও শক্তির অস্তিত্ব নেই। সর্বপ্রকারের শক্তি ঈশ্বর দ্বারা আরোপিত। এই ক্ষমতার প্রতিকূলাচরণ যেই করুক না কেন, তা ঈশ্বরদ্রোহিতা এবং যারা এইভাবে তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ করে, তাদের চিরকালীন নরকবাস অনিবার্য।" কেবল খ্রীষ্টানদের মধ্যেই নয়, প্রাচীনকালের ইহুদি, মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যেও এ বিশ্বাস ক্রিয়াশীল ছিল এবং বর্তমানে এই ধারণা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে গেলেও জাপানের অধিবাসীরা তাঁদের সম্রাটকে এই দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। ইউরোপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই

মতবাদের প্রাবল্য ছিল। অযৌক্তিক ব'লে বর্তমানে এ মতবাদ পরিত্যক্ত।

দণ্ডশক্তি

পরবর্তীকালে দণ্ডশক্তির মতবাদ (force theory) প্রচলিত হয়। লিককের ভাষায় এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর অর্থ এই যে সরকার মানুষের আক্রমণাত্মক বৃত্তির পরিণাম। মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর বিজয়াভিযান এবং একে অপরকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রথার ভিতরই রাষ্ট্রের জন্মের বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্বল যূথ বা গোষ্ঠীকে (tribe) জয় ক'রে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার এর নিদর্শন অর্থাৎ অধিকতর দৈহিক শক্তির কারণ-সঞ্জাত স্বার্থান্ধ আধিপত্য-বৃত্তি মূলতঃ এর পিছনে রয়েছে। যূথ থেকে রাজ্য এবং তার থেকে সাম্রাজ্য—এই ক্রমবিকাশ একই পদ্ধতির পরিণতি।" কিন্তু এ মতবাদও আংশিকভাবে সত্য। কারণ রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা সংহতির পক্ষে দৈহিক বল এক অন্যতম কারণ হ'লেও অদ্বিতীয় কারণ নয়। আত্মীয়তাবন্ধন বা রক্তসম্বন্ধ, ধর্ম এবং শান্তিময় লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বহুবিধ কারণের সম্মিলিত ফল হচ্ছে রাষ্ট্র। অতএব এই মতবাদও আজ পরিত্যক্ত হয়েছে।

সামাজিক চুক্তি

পূর্বোক্ত দুই মতবাদের তুলনায় সামাজিক চুক্তির মতবাদ (Social Contract Theory) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির পিছনে এই মতবাদ বহুলাংশে ক্রিয়াশীল। সফিস্ট নামে অখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের রচনায় সর্বপ্রথম এর আভাস পাওয়া গেলেও বহুপরবর্তী হব্‌স, জন লক এবং রুসোর দ্বারা এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এই

মতে রাষ্ট্র ঈশ্বর-সৃষ্ট কোন বস্তু নয়, বা দীর্ঘকালীন বিকাশের ফলে জাত ব্যবস্থাও নয়। মানবজাতির ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে অকস্মাৎ যে রাজনৈতিক চেতনার আবির্ভাব হয়েছিল, তার পরিণামেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সামাজিক চুক্তির মতবাদের প্রবক্তারা বলেন যে, রাজনৈতিক যুগের পুর্বে মানবসমাজে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল এবং সে অবস্থায় কারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কোন রকম নিরাপত্তা বা সুখস্বস্তির অস্তিত্ব ছিল না। ওই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার অশান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ নিজের স্বাভাবিক স্বাধীনতার কিছুটা বর্জন ক'রে সমাজের বশ্যতা স্বীকার করল। এক দিকে ত্যাগ স্বীকার করলেও সামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার অর্জন করার জন্য তার এই লোকসান পুষিয়ে গেল।

হব্‌স

আধুনিক কালে সামাজিক চুক্তির মতবাদের তিন জন প্রবক্তার অন্যতম হব্‌স-এর (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) মতে মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর, কলহপ্রিয় ও আক্রমণাত্মক মনোভাববিশিষ্ট। নিছক সামাজিক জীবনের খাতিরে সমাজের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। তিনি তাই বলেন যে, মানুষ এই অনিশ্চিত অবস্থাজনিত একটানা ভয় ও মৃত্যুভীতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা এমন এক "সামুহিক শক্তি বা সংগঠনের সুত্রপাত করল, যা তাদের মনে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ের সৃষ্টি ক'রে তাদের সর্বসাধারণের মঙ্গলাভিমুখে পরিচালিত করবে"। এই ব্যবস্থায় সবাই "তাদের সর্ববিধ শক্তি ও ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ" ক'রে নিজেদের বহুমুখী ইচ্ছাকে অনন্য ইচ্ছার ঐক্যে রূপান্তরিত করে। হব্‌স-এর বক্তব্য অনুসারে শাসক এই চুক্তির কোন পক্ষ না হওয়ায় তার ক্রিয়াকলাপের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধন থাকে না এবং ফলে তার স্বৈরতন্ত্রী হতে কোন বাধা নেই। আর জনসাধারণ তাদের সব অধিকার শাসকের হাতে তুলে

দেয় ব'লে প্রয়োজন হ'লে শাসকের বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহ করার অধিকারও তাদের থাকে না।

হব্‌স-এর বিচারধারার ফলে গণতন্ত্রের অধোগতি ও স্বেচ্ছাচারের পথ সুগম হয়েছিল। হব্‌স-এর মত আজ অগ্রাহ্য। মানুষকে প্রধানতঃ অসামাজিক পশু মনে করার ভিতর তাঁর এই অ-গণতান্ত্রিক নিদানের মূল নিহিত। বলা বাহুল্য হব্‌স-এর ধারণা ভ্রান্ত; কারণ মানুষের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মত সহযোগিতাও এক সহজ বৃত্তি।

লক

লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ) অবশ্য মানুষকে হব্‌স-এর মত পশু-ভাবাপন্ন মনে করতেন না। তাঁর মতে প্রাকৃতিক অবস্থার মানুষ মোটামুটি যুক্তিশীল হ'লেও সমাজে কোন চূড়ান্ত মধ্যস্থ না থাকলে ব্যক্তি-মানবের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অসুবিধা হতে বাধ্য। আইন-কানুন স্বভাবতঃ দুর্বোধ্য হবার ফলে যে যার ইচ্ছামত এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারে। এইজন্য মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থা বর্জন ক'রে সামাজিক বিধি-নিষেধ স্বীকার ক'রেও এই ভাবে কিছুটা স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়। এই সামাজিক চুক্তির পরিণামে সমাজের হাতে সকলের কল্যাণের জন্য সকলের পক্ষে স্বীকার্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হয় ও সকল নাগরিককে এর প্রয়োগে সহায়তা করতে আহ্বান জানানো হয়। এর পর আসে প্রশাসনীয় চুক্তির অধ্যায়। পূর্বোক্ত বিধি-বিধানকে কার্যান্বিত করার জন্য শাসন-ব্যবস্থা সৃষ্ট হয় এবং তার হাতে প্রশাসনক্ষমতা দেওয়া হয়। সমাজ ওই সব আইন পালন করানোর ব্যাপারে শাসন-ব্যবস্থাকে সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হয়। সুতরাং শাসক যদি চুক্তি পালনে অসমর্থ হয়, অর্থাৎ যদি জনহিতবিরোধী আইন প্রণয়ন করে ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে তা হ'লে শাসককে পদচ্যুত ক'রে নূতন শাসক নিযুক্ত করার অধিকার সমাজের থাকে। এর জন্য পুরাতন প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। লক-এর এই সামাজিক চুক্তির মতবাদের

ফলস্বরূপ গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হয়, জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়।

রুসো

রুসো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) যে প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার অধীন মানুষের সাংস্কৃতিক স্তর হব্‌স এবং লক-এর বর্ণিত অবস্থার মাঝামাঝি। মানুষ সেখানে ভদ্র বর্বর। চারুকলা, শিল্প-ব্যবসায় অথবা বিজ্ঞান তাদের নিকট অবিদিত এবং তারা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য জানে না। তবে তাদের ভিতর প্রাণপ্রাচুর্য ও স্বাভাবিক মমত্ববোধ বিদ্যমান এবং এইজন্যই তারা সুখী। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য তাদের এই প্রাকৃতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। তাদের সম্মুখে তাই যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার স্বরূপ হচ্ছে, "এমন এক সঙ্ঘ-ব্যবস্থার আবিষ্কার করা, যা সমগ্র সমাজের শক্তি নিয়ে এর অঙ্গীভূত প্রতিটি ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং যার প্রসাদে প্রত্যেকে অন্য সকলের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হবার পরও কেবল স্বীয় নির্দেশেই চলবে ও এই ভাবে পূর্ববৎ স্বাধীন থেকে যাবে"। রুসোর কথিত সামাজিক চুক্তির এক পক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি নাগরিক, এবং অপর পক্ষ হচ্ছে সেই সব নাগরিকদেরই সম্মিলিত বা যৌথ স্বরূপ। অর্থাৎ ক, খ এবং গ তাদের ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক অধিকার ক, খ ও গ-এর এক সম্মিলিত সত্তার কাছে সমর্পণ করল। প্রতিটি নাগরিক এই ব্যবস্থা অনুযায়ী একাধারে এক সার্বভৌম সংগঠনের সদস্য এবং সেই সংগঠনের প্রজাও বটে। রুসোর মতে রাষ্ট্র বা তার আমলারা এই সার্বভৌম সমাজের ইচ্ছা পালনের কর্মচারী মাত্র এবং তারা যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপসারিত ক'রে নূতন কর্মচারী নিয়োগ করা সমাজের ইচ্ছাধীন। রুসো সরকারকে আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না, সে অধিকার ওই সার্বভৌম সমাজের এলাকাভুক্ত। তবে রুসো মনে

করতেন যে, জনসাধারণ যখন সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (General will) প্রতিনিধিত্ব করবেন, অর্থাৎ তাদের আচরণে যখন এই সাধারণ ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে, তখনই তারা কেবল সার্বভৌম। রুসোর এই সাধারণ ইচ্ছা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা বা সকলের ইচ্ছার সম্মিলিত ফল হ'লে চলবে না, সমাজের সাধারণ কল্যাণ বা হিতের নির্দেশ এর ভিতর থাকা চাই। রুসোর বর্ণিত এই সাধারণ ইচ্ছা শুদ্ধ ও অসম্পৃক্ত বা অনাসক্ত; কারণ যুক্তিবাদই এর একমাত্র আধার। আর সেই জন্যই সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রুসোর এই সাধারণ ইচ্ছার মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।

আধুনিক রাজনীতি-বিজ্ঞান অবশ্য রাষ্ট্রের জন্মের কারণ হিসাবে এই সামাজিক চুক্তির মতবাদকে অগ্রাহ্য করেছে। কারণ, দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রের এই ভাবে জন্মের কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। বহুদিন যারা আদিম প্রাকৃতিক অবস্থায় থেকে বিবাদ-বিসম্বাদ করেছে, তারা হঠাৎ একদিন সুবুদ্ধিচালিত হয়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মত জটিল সামাজিক সংগঠন সঞ্চালিত করতে থাকবে—এটা বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যাপার। মানবসমাজের প্রাথমিক একক্ (unit) ব্যক্তি ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং ব্যক্তি-মানবের ভিতর সামাজিক চুক্তি হবার কথা কবি-কল্পনা মাত্র। মানব-ইতিহাসকে সামাজিক চুক্তির মতবাদ অনুযায়ী আদিম প্রাকৃতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রনির্ভর আধুনিক অবস্থা—এইরকম দুই ভাগে বিভক্ত করার স্বপক্ষে কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তা ছাড়া সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়া বা না হওয়া কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার হ'লে তবেই এই চুক্তির একটা অর্থ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তা না হয়ে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই সব নানা কারণের জন্য এই মতবাদ আজকাল অচল।

বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সর্বাধুনিক বিচারধারাকে বিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary theory) আখ্যা দেওয়া হয়। এতদনুযায়ী রাষ্ট্রের জন্ম এক অজ্ঞাত অতীত যুগে আরম্ভ হয়ে এক ধীর গতির বিবর্তনের ফলে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়েছে। এর কারণ একটি নয়। বহু শক্তির সমন্বয় ও সমবায়ে বিকশিত পরিণতি হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। তবে বিবর্তনমূলক মতবাদে বিশ্বাসীরাও এর পর্যায় বা ক্রম সম্বন্ধে একমত নন। অনেকের মতে পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার থেকে রাষ্ট্রের বিকাশ হয়েছে। পরিবারে পিতার নির্দেশেই সন্তান-সন্ততি চ'লে থাকে। তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র এইরকম পরিবারের বৃহত্তর রূপ। পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি পেতে পেতে যূথ বা গোষ্ঠীর (clan) আকার ধারণ করে এবং এইরকম বহু গোষ্ঠীর সম্মিলনে কৌম (tribe) ও তার থেকে জাতির সৃষ্টি হয়। এইভাবে একই পূর্বপুরুষের সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ মানুষের দ্বারা রাষ্ট্রের আধার রচিত হয়। তবে বিগত শতাব্দীতে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা হয় তার দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয়েছে যে, পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার-প্রথার সমর্থকরা এ ব্যবস্থা যত ব্যাপক ছিল ব'লে প্রচার করেন, ততটা কিন্তু যথার্থ নয়। অনেকে এমন কি একথাও বলেন যে, প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন পরিবার নয়, কৌম। পরিবার কৌমের থেকেই সৃষ্ট। আর এই কৌমের পারস্পরিক সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে পুরুষ নয়, নারীর মারফত। সুতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রের জন্মের কারণ হিসাবে মাতৃকেন্দ্রিক (matriarchal) মতবাদের পোষকতা করেন। সাময়িক বিবাহসম্বন্ধ, সন্তানের উপর মায়ের কর্তৃত্ব এবং নারীর মাধ্যমে কৌটম্বিক সম্বন্ধসূত্রের ব্যাপ্তি ইত্যাদি এইজাতীয় সামাজিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। যাই হ'ক, এই সব সমাজ-বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, সংগঠিত রাজনৈতিক জীবনের পূর্বে কোন না কোন

ধরনের পারিবারিক জীবন ও কৌটম্বিক বন্ধন সমাজে ক্রিয়াশীল ছিল এবং এক-পতি-পত্নী-প্রথা-আধারিত পরিবার ক্রমশঃ প্রভাবশালী হয়ে উঠল। অবশেষে এই প্রথা বিকশিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল।

তিনটি ধাপ

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, দণ্ডশক্তিকে ব্যক্তির হাত থেকে গোষ্ঠী বা তার প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার পর থেকে মানবসমাজে নববিধানের সূত্রপাত হ'ল। সভ্যতার আদিম যুগে মানুষ যখন বর্বর অবস্থায় ছিল, তখন জঙ্গলের বিধান বা "জোর যার মুলুক তার"—নীতি তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করত। 'দাঁতের বদলে দাঁত' এবং 'চোখের বদলে চোখ' নেওয়াই ছিল তখনকার নিয়ম। ক্রমাভিব্যক্তির অববাহিকা বেয়ে মানুষ তারপর অনেক দূর এগিয়ে গেল। তখন মানবসমাজে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ দেখা দিলে আইন-কানুন এবং পঞ্চায়েত আদালতের সাহায্যে তার সমাধান করা হতে লাগল। মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে না নিয়ে এক তৃতীয় পক্ষ বা রাষ্ট্রের হাতে হিংসা প্রয়োগ দ্বারা কাউকে কোন সমাজবিরোধী কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার সঁপে দিল। আজকের এই অবস্থা থেকে তৃতীয় পর্যায়ে যাবার জন্য মানুষ প্রয়াস করছে। ভবিষ্যতের সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় প্রেমই হবে পারস্পরিক সম্বন্ধের নিয়ামক। ব্যক্তিগত হিংসা বা হিংসার গোষ্ঠীগত বৈধানিক রূপ রাষ্ট্রশক্তি ও আইন-কানুনের পরিবর্তে প্রেম বা অহিংসাই তখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবল হয়ে মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করবে। সমাজের সংহতি বিধৃত ক'রে রাখার প্রেরক-শক্তি হবে প্রেম বা ভালবাসা।

গ্রন্থপঞ্জী

Elements of Political Science—অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ সুদ

History of European Political Philosophy—
অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারী

A History of Political Theory—জর্জ স্যাবিন

॥ ২ ॥

শাসনমুক্তি—কেন ?

কিসের জন্য ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিসের জন্য এর এমন তীব্র প্রয়োজন? রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে অল্পবিস্তর ইঙ্গিত করা হয়েছে। হিংসাকে ব্যক্তির হাত থেকে গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবার পর রাষ্ট্রের জন্ম হয় অর্থাৎ মূলতঃ দুই পক্ষের ভিতর বিবাদ উপস্থিত হ'লে মধ্যস্থতা করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ক্রমে রাষ্ট্র মধ্যস্থের ভূমিকা থেকে জনসাধারণের প্রভুর পর্যায়ে উন্নীত হয় অর্থাৎ লেনিনের কথায় বলতে গেলে, "রাষ্ট্র দমনেরই যন্ত্র" স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। লেনিনের এই কথায় যথেষ্ট সত্য আছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থকেরা রাষ্ট্রের এই-ই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব'লে স্বীকার না করলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে আজ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র মূলতঃ পীড়ন-যন্ত্র। আধুনিক যুগে আমরা রাষ্ট্র-যন্ত্রের বিভিন্ন রূপ দেখতে পেলেও রাষ্ট্রের পূর্বোক্ত মৌলিক চারিত্রধর্মের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। হিটলার মুসোলিনীর পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্রে যেমন রাষ্ট্র সর্বেসর্বা ছিল, কমিউনিস্টদের উপাস্য সর্বহারাদের একনায়কত্বেও রাষ্ট্র সেইরকম প্রবলপ্রতাপান্বিত জনসাধারণকে দলনকারী চূড়ান্ত ক্ষমতার আকর। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও যে কত প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক হতে পারে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্টালিন সম্বন্ধে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট তার অন্যতম প্রমাণ। ক্রুশ্চেভ অবশ্য এর জন্য ব্যক্তিপূজার মনোবৃত্তিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-পদ্ধতিতে ব্যক্তিপূজার মনোবৃত্তি সৃষ্টির পথ বন্ধ করার উপায় কি? সোভিয়েট রাশিয়ার প্রচলিত রাষ্ট্রিক কাঠামো বজায় রাখলে আবার যে স্টালিন বা বেরিয়ার মত "অত্যাচারী ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারীর" জন্ম হবে না তার নিশ্চয়তা কি? প্রত্যুত, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের উপায়

থাকলে ম্যালেনকভ, মলোটভ, কাগানোভিচ বা জুকভ প্রভৃতি যে ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করতেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং নিয়তির পরিহাসে বর্তমানে যে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত ও একরকম নজরবন্দী, তিনি যদি স্বাধীন ভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেতেন তা হ'লে স্ট্যালিনকন্যা স্বেৎলানার মত তিনিও রাশিয়ার বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করতেন। এমন কি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত শিল্পী সাহিত্যিকদেরও কেবল স্বাধীন মত ব্যক্ত করার জন্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কী নিগ্রহ বরণ করতে হয় তার সাম্প্রতিক নিদর্শন বোরিস পাস্তারনক ও তাঁর পরিবার পরিজনবর্গ এবং নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত তারগিস ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত দুই সাহিত্যিক আঁদ্রেই সিন্যায়েভস্কি ও ইউলি দানিয়েল।

কেবল রাশিয়ায়ই নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নকারীর স্বরূপ অপর এক প্রমুখ কমিউনিস্ট দেশ চীনেও প্রকট। আর পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে বর্তমানে যে রাষ্ট্রবিপ্লব চলেছে তার মূলে রয়েছে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বকারী বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এও আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

প্রচলিত গণতন্ত্র

এবার গণতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থা দেখা যাক। পার্থিব দিক থেকে অমিত প্রগতিশালী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখনও কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত। এর ফলে গণতান্ত্রিক আখ্যাপ্রাপ্ত সে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশের এবং সংবাদ-সমাচার পাবার অধিকার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের চেয়ে কিছু অধিক পরিমাণে থাকলেও প্রচলিত অবস্থাকে মোটেই সন্তোষপ্রদ আখ্যা দেওয়া যায় না। কেবল একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রেই নয়, ভারতবর্ষসহ তাবৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেতার ও সংবাদপত্রগুলি অল্পাধিক পরিমাণে সরকার ও পুঁজিপতিগোষ্ঠী কর্তৃক

নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় জনগণের স্বাধীনতা আজ বহুলাংশে খর্ব। একমাত্র ইংলণ্ড ও অন্য দু-একটি দেশে এর কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ বহু শতাব্দী যাবৎ গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস ক'রে এসেছে ব'লে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় ইংলণ্ডের অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত। কিন্তু এত চেতনাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাদের সরকার কর্তৃক মিশর আক্রমণ বন্ধ করতে পারেনি। আক্রমণ আরম্ভ হবার পর জাগ্রত জনমত ও বিশ্ববাসীর অভিমতের চাপে তা নিরস্ত হলেও মিশরের তাৎকালিক ক্ষতি রোধ করা যায়নি। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা সাম্যবাদী একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের মাঝামাঝি। কোন দেশ একটু এদিকে আবার কোন দেশ একটু ওদিকে ঝুঁকে আছে। মোট কথা, জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের কুত্রাপি তার প্রথম ধাপ—তাদের নির্ব্যূঢ় স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই।

গণতন্ত্রের ত্রুটীবিচ্যুতি

জনসাধারণের স্বাধীন আত্মবিকাশের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কমিউনিস্ট একনায়কত্বের তুলনায় গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে অনেক বেশী কাম্য হ'লেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ত্রুটীবিচ্যুতিও মারাত্মক। প্রত্যুত, এরই জন্য কমিউনিস্ট ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয়ঃ হওয়া সত্ত্বেও মানবকল্যাণকামীদের অন্য পথের সন্ধান করতে হয়। গণতন্ত্রের কি এমন মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে যার জন্য নবীন পন্থানুসন্ধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে? গণতন্ত্রে ভোটের অধিকারকে ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে এক প্রবল আয়ুধ ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু এই ভোটের শক্তি কতটুকু? পৃথিবীর কোথাও সৎ অথচ দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ভোটযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সহজ নয়। তার জন্য চাই বিত্তশালীর অর্থ, নয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ নির্বিচারে দলীয় চক্রের কাছে নতি স্বীকার করার মনোবৃত্তি। অথবা এককালীন উভয়ই চাই। এর পর ভারতের মত আধুনিক শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে, যেখানে

কোন কোন ভোটদাতা ভোট দিতে গিয়ে ব্যালট-বাক্স পূজা করে বা কোন প্রার্থীর নির্বাচন-প্রতীক বটগাছ হ'লে ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী বটগাছে ব্যালট পেপার টাঙাতে যায়, সেখানকার কথা না হয় না-ই ধরা হ'ল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি শিক্ষিত দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের অধিকাংশ কথাই বোঝে না। একমাত্র যে সব কর-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের স্বার্থ স্পর্শ করবে, সেগুলি ছাড়া অধিকাংশ শাসন-বিভাগীয় বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ নাগরিক ইচ্ছা থাকলেও মাথা ঘামাতে পারে না। এমতাবস্থায় জনসাধারণ ভোটাধিকার দ্বারা পেশাদার রাজনৈতিক নেতা আর ঝানু আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে—এ কথা চিন্তা করাই ভুল।

গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠতন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বরূপ কি? সংসদে কোন দলের সদস্যসংখ্যা শতকরা ৫১ হলে বাকী ৪৯ জনের উপর তারা তাদের মর্জি চাপিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ৫১ জনকে ৪৯ জনের উপর রাজত্ব করার এই ভগবদ্দত্ত অধিকার কে দিল? তা ছাড়া সংসদ বা ব্যবস্থা-পরিষদের এই শতকরা ৫১ জন প্রতিনিধি মোট জনসাধারণের অধিকাংশের ভোট নাও পেতে পারেন। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে ইংলণ্ডে শ্রমিক দল টোরীদের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পেয়েও পার্লামেণ্টে তাদের চেয়ে বেশী আসন পায় নি। ভারতের বিগত দুই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কম পেলেও সমগ্র দেশের উপর রাজত্ব চালাচ্ছে। বিগত তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ত' কেন্দ্রীয় সরকারসহ বহু প্রদেশের সরকারই সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তারপর সচরাচর মোট ভোটদাতার শতকরা পঞ্চাশ ষাট ভাগই ভোট দিয়ে থাকেন। তাই যদি হয় ত' এই সাকুল্য ভোটদাতাদের শতকরা ষাট জনের ভিতর মাত্র চল্লিশ ভাগ বা তার কম ভোট পেয়েও যে দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে শাসন চালায়, তাদের রাজত্বকে অধিকাংশের

মতে নির্বাচিত শাসন-ব্যবস্থা কি ক'রে বলা যায় ? এ ত' আসলে সংখ্যালঘুদের রাজত্ব। এর প্রতিকারের জন্য অনেকে প্রপোর্শানাল রিপ্রেজেণ্টেশান (যে দল শতকরা যতগুলি ভোট পাবে মোট আসনের শতকরা তত সংখ্যক আসন তারা পাবে) প্রথার কথা বলেন। কিন্তু একে কার্যকর করতে হ'লে একে ত' অতীব সচেতন ভোটদাতা চাই, তার উপর দলের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ফ্রান্সের মত কোন সবল ও স্থায়ী সরকার গঠন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং অবশেষে এর পরিণামে ফ্রান্সেরই মত গণতন্ত্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা ক'রে পুনরায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করাও বিচিত্র নয়। এই সব কারণে বহু বৎসর যাবৎ প্রপোর্শানাল রিপ্রেজেণ্টেশান প্রথার অনুগামী থাকার পর কিছুদিন পূর্বে আয়ারল্যাণ্ড এই ব্যবস্থা বর্জন করার সিদ্ধান্ত করেছে।

এখানেই এ ব্যাপারের শেষ নয়। ধরে নেওয়া যাক পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ মোট ভোটদাতাদের শতকরা চল্লিশ বা তারও কম ভোট পেয়ে কোন দল সরকার গঠন করল এবং সংসদে তাদের দলের সদস্যসংখ্যা হ'ল ১০০ জন। ভূমির সর্বোচ্চ সীমা কি হবে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কিনা বা ওই জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকারী দলের সংসদ-সদস্যের শতকরা ৫১ জনের যা মত হবে, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তা-ই দলের সকলকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। তারপর সংসদে ভোটের জোরে সমগ্র দেশের উপর শাসকদলের শতকরা ৫১ জনের অভিমত চাপিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ মোট ভোটদাতার শতকরা চল্লিশ জনের প্রতিনিধির শতকরা ৫১ জনের রায় অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দেশের শতকরা ১৮ বা ১৯ জনের রায় সমগ্র দেশের অভিমত ব'লে প্রচারিত হবে। এ ছাড়া সাধারণতঃ অধিকাংশ প্রশ্ন মন্ত্রিমণ্ডলী মীমাংসা ক'রে দেন। মন্ত্রিমণ্ডলীতে দলের নেতার মনোনীত ব্যক্তিরাই থাকেন। সরকারী দল কোন এক প্রভাবশালী সদস্যকে দলের নেতা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করলেও সব ব্যাপারে যে তাঁর মতই সকলের গ্রহণযোগ্য হবে

তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব সংসদীয় গণতন্ত্রও শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে জওহরলালজী, চার্চিল বা রুজভেল্ট-এর মত "এক প্রভাবশালী ব্যক্তির রাজত্ব" বা প্রকারান্তরে অপেক্ষাকৃত মৃদু মাত্রার স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে দলীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ প্রথমেই দলীয় ভেদ-বিভেদের কথা প্রচার ক'রে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করতে হয় এবং এর ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপর বিরোধী দলের লক্ষ্য থাকে ক্রমাগত শাসকদলকে লোকচক্ষে অপ্রিয় ক'রে তুলে পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া। সুতরাং সরকারের কোন ভাল কাজেও তাঁরা সহযোগিতা করেন না, কারণ তা হ'লে শাসকদলের "প্রেস্টিজ" বৃদ্ধি পাওয়ায় বিরোধীদের অসুবিধা হবে। আর শাসকদলও খোলা মনে বিরোধীদের কোন সহযোগিতা চান না। কারণ তাঁদের মনে ভয় থাকে যে, বিরোধীরা এর ফলে শক্তিশালী হয়ে পড়বে। এই ভাবে পারস্পরিক সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ইত্যাদির কারণে দেশে এক বিচিত্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এক দল নিছক বিরোধিতার জন্য বিরোধ করতে করতে ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের হয়ে পড়ে এবং অপর দল বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের যাবতীয় কার্যকলাপকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাঁদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই মনোভাব সমগ্র দেশের লোকমানসকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং এর ফলে জাতির উন্নতি ও প্রগতি যে ভীষণভাবে ব্যাহত হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এসিয়ার যে-সব দেশ সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে সেগুলিতে একের পর এক গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হওয়ার পর সামরিক একনায়কত্বের সৌধ ওঠার পিছনে এই সব কারণের হাত কম নয়।

গণতন্ত্রের অর্থনীতি

গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকের অবস্থা দেখা গেল, এবার এর আর্থিক দিকের কথাও একটু বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে

নৈর্ব্যক্তিক উদাহরণ ছেড়ে দিয়ে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করব। হিতব্রতী বা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র (Welfare State) গঠন করা ভারতের লক্ষ্য ব'লে নির্ধারিত হয়েছে। রাষ্ট্র এ দেশে যাবতীয় জনকল্যাণকারী ও সমাজসেবামূলক কার্য করার ক্ষেত্রে অগ্রণী হবে। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, এই হিতব্রতী নামে আখ্যাত রাষ্ট্রও কার্যতঃ প্রচ্ছন্ন একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু নয় এবং শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় রাষ্ট্রেরও প্রকাশ্যভাবে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে পড়ার পূর্ণ আশঙ্কা বিদ্যমান। শাসন এবং বিচারব্যবস্থা তো রাষ্ট্রের হাতে ছিলই, এর উপর শিক্ষা, সমাজোন্নয়ন এবং খাদ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাও যদি সরকারের হাতে যায়, তাহলে প্রত্যুত জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়ে পড়ে। সরকারকে যদি জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যাবতীয় ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে জাতির সম্পদের প্রতিটি উৎস (মনুষ্যশক্তি বা man-powerও এর ভিতর পড়ে) এবং তার পরিচালনার উপরও যে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—এ তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কারণ এই জাতীয় নিরঙ্কুশ অধিকার ছাড়া যাবতীয় কল্যাণসাধনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। আর এই সব যাবতীয় কার্যকলাপের সঞ্চালক রাষ্ট্র কোন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়, এর প্রত্যক্ষগোচর রূপ হচ্ছে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ হিতব্রতী রাষ্ট্রেও অমিত শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হবে। সংসদ বা বিধান সভার মারফত এর উপর গণনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কল্পনা ফলপ্রসূ হবে না। কারণ সংসদ বা বিধান সভার কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব আমলাদের উপর থাকে না এবং মন্ত্রীরাও নজির ও "প্রেস্টিজের" ভয়ে এবং "এফিসিয়েনসি" বা যোগ্যতার দোহাই দিয়ে লোকসভা বা বিধান সভার সদস্যদের প্রশ্নবাণের হাত থেকে আমলাদের রক্ষা করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর মারফত এঁদের নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন্। কারণ একমাত্র অত্যন্ত প্রতিভাবিশিষ্ট মন্ত্রী ছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রীদেরই বিভাগীয় কার্য

পরিচালনার জন্য অন্ধভাবে আমলাদের উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমান শাসনব্যবস্থা অত্যধিক কেন্দ্রিত হবার ফলে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের জনসংযোগের জন্য ও ক্ষমতা প্রাপ্তির সোপান—পার্টির কাজে বেশ কিছুটা সময় দিতে হয় ব'লে তাঁদের পক্ষে আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর উপর মন্ত্রীদের মত পাঁচ বৎসর অন্তর আমলাদের কর্মচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না ব'লে শাসনযন্ত্রের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি তাঁদের নখদর্পণে থাকে। অতএব হিতব্রতী রাষ্ট্রেও আমলা এবং বিশেষজ্ঞদের একটি কায়েমী স্বার্থ জোট বাঁধবে এটা স্বাভাবিক।

একটি মৌলিক ত্রুটী

সংসদীয় গণতন্ত্র ও হিতব্রতী রাষ্ট্রের কল্পনার ভিতর আর একটি মৌলিক ত্রুটী বিদ্যমান। এই ব্যবস্থায় সব কিছুই প্রতিনিধিদের দ্বারা করানো হয়। লোককল্যাণের আইন রচনা করেন জনপ্রতিনিধিরা এবং তদনুযায়ী লোকহিতকার্য করেন সরকারী কর্মচারীরা। জনকল্যাণের জন্য কর দেওয়া ছাড়া জনসাধারণের আর করণীয় কিছু নেই। এর ফলে যে প্রতিবেশী-ধর্ম এবং দয়া, মায়া, প্রেম ও করুণা ইত্যাদির কারণে মানুষ তার পূর্ববর্তী গুহা-মানবের অবস্থা থেকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তার অগ্রগতি বা অধিকতর বিকাশের পথ আর থাকে না। পথে কোন রোগাক্রান্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দেখলে সরকারী হাঁসপাতাল বা লঙ্গরখানায় একটা টেলিফোন ক'রে দেওয়া ছাড়া বিপন্ন মানবের জন্য হিতব্রতী রাষ্ট্রের নাগরিকের আর কোন কর্তব্য থাকে না। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা মানুষের চারিত্রধর্মের বিকাশের পরিপন্থী। এর পরিণামে মানবসভ্যতারও অধোগতি হতে বাধ্য। মানুষের স্ব-তন্ত্র অন্তঃপ্রবৃত্তির (free will) মুক্তিসাধনাই সভ্যতার উদ্দেশ্য—অন্তঃপ্রবৃত্তির ক্রমিক বিকাশই প্রগতির প্রকৃত মানদণ্ড। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে এই অন্তঃপ্রবৃত্তি যদি কার্যকর হবার

সুযোগই না পায়, তাহলে প্রগতি ও সভ্যতা ইত্যাদির ভবিষ্যৎ কোথায় ?

বিশ্বশান্তির জন্য

মুষ্টিমেয়সংখ্যক ব্যক্তির হাতে এইভাবে অমিত ক্ষমতা কেন্দ্রিত হওয়া, অল্প কয়েকজনের হাতে সমগ্র দেশের জীবন-কাঠি, মরণ-কাঠি থাকা যে গণতন্ত্র বা তার আধার ব্যক্তিমানবের সর্বাঙ্গীণ ও সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী, এ কথা বোঝা যাচ্ছে। তার উপর এই ভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বিশ্বশান্তির পক্ষেও ক্ষতিকারক। ক্ষমতার ধর্মই হচ্ছে এই যে, তা এমন কাউকে সহ্য করতে পারে না, যে ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব ও ক্রমকেন্দ্রীকরণের পক্ষে বাধা হয়ে উঠবে। অতএব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রে থাকে। সাম্প্রতিক কালে অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দুই মহাযুদ্ধ (১৯১৪ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) এ কথার প্রমাণ দিয়েছে। এর পরও আজ দুই কেন্দ্রিত শক্তির পীঠভূমি আমেরিকা ও রাশিয়া স্নায়ুযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বশান্তিকে বিঘ্নিত করেছে, এও আমরা দেখছি।* অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মানবের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনার জন্য রাষ্ট্র অর্থাৎ দণ্ডশক্তির বিলুপ্তি অপরিহার্য। প্রকৃতির নিয়মে একদা প্রজাপতির শূককীট তার চতুর্দিকে গুটি তৈরী করলেও অধিকতর বিকাশ লাভ করার পর নিজের তৈরী গুটি কেটে বাইরে বেরোয়। মানুষও তেমনি একটা সামাজিক নিয়মের জন্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সৃষ্টি করলেও, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ তার অস্তিত্ব বিলোপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সত্যকার অর্থ

তবে প্রথমেই এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, শাসনমুক্ত সমাজ

* এবং বর্তমানে চীনও।

সর্বোদয় আদর্শের অন্তিম স্থিতি। এ লক্ষ্যে উপনীত হবার কোন সোজা পথ নেই। ধাপে ধাপে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। বর্তমানের রাষ্ট্রনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা থেকে শাসনমুক্ত সমাজে উপনীত হবার প্রথম ধাপ হচ্ছে তাই শাসন-নিরপেক্ষ সমাজ গঠন। বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ-বিপ্লবীকে সেই জন্য বর্তমানে শাসন-নিরপেক্ষ সমাজের রূপায়ণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং ক্রমে এই ব্যবস্থা পরিণতি লাভ করলে শাসনমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

Socialism to Sarvodaya — জয়প্রকাশ নারায়ণ

A Plea for the Reconstruction of Indian Polity — " "

The Community of the Future and the Future of the Community — আর্থার ই. মরগ্যান

The Sane Society — এরিখ ফ্রম

স্বরাজ্য শাস্ত্র — বিনোবা ভাবে

নূতন দৃষ্টিতে সমাজবাদ — মিনু মাসানী

বিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও শান্তি — আলডুস হাক্সলে

লোক স্বরাজ্য (হিন্দী) — জয়প্রকাশ নারায়ণ

॥ ৩ ॥

অতীতকালের প্রয়াস

পূর্বতন-পথিকৃতের দল

শাসন বা বাহ্য নিয়ন্ত্রণ বিহীন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার কথা কেবল এ যুগেরই দাবি নয়, যুগে যুগে নূতন বিশ্ববিধান গড়ার স্বপ্ন মানুষ দেখেছে এবং ন্যায়বিচারপূর্ণ সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে তোলার জন্য দেশে দেশে সর্বকালে মনীষী ও কর্মযোগীরা নিরলস প্রয়াস ক'রে এসেছেন। এ প্রচেষ্টার সমাপ্তি কোনদিনই হবে না। প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তাশীল এবং কর্মযোগীদের এই যে প্রয়াস, তা আমাদের কাছে একান্তভাবে শিক্ষাপ্রদ। কারণ এ সম্বন্ধে অতীত প্রয়াস ও তার সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ সম্যক্‌ভাবে না জানলে ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের কাজ সুবিহিত হবে না।

প্লেটোর দার্শনিক-রাজা

প্রাচ্য দেশের উপনিষদ্‌ বা প্রাচীন চৈনিক ধর্মগ্রন্থসমূহে অস্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে সামাজিক নববিধান প্রবর্তনের ইঙ্গিত থাকলেও সমাজ-শাস্ত্র বা রাজনীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেবল পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেই বিধিবদ্ধ আলোচনা হয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে না। এর মূলে হয়ত প্রাচ্যদেশবাসীর অতিমাত্রায় পরলোক-প্রেম ও ইহলোকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু সে কথা আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে বোধ হয় এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাচীন গ্রীসের বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোই (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৭ অব্দ) এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে, দার্শনিক-রাজার রাজত্বকেই আদর্শ স্থিতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সেই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় তিনটি বিষয় মুখ্য হবে: (১) শিক্ষা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হবে, (২) উচ্চবর্ণের

ভিতর সম্পত্তি ও স্ত্রীজাতির অধিকারসাম্য থাকবে, এবং (৩) দর্শনের বিধান চলবে। রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন একজন দার্শনিক-রাজা, যাঁকে ন্যায় বা যুক্তির প্রতিনিধি বলা যেতে পারে এবং সেই জন্য তাঁর কার্যকলাপে অন্যায়ের স্পর্শ থাকবে না। প্লেটোর আদর্শ-রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য হবে দার্শনিক প্রশাসক সরবরাহ এবং প্রতিটি মানুষকে তার যথার্থ পেশা খুঁজে বার করায় সাহায্য করা। এই উচ্চবর্ণের লোকেদের সম্পত্তি ও স্ত্রীর অধিকারসাম্য এই জন্য প্রয়োজন যে, এর ফলে তাঁরা আর্থিক বা বৈষয়িক প্রলোভন জয় ক'রে রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হবেন। দার্শনিক-রাজা স্বার্থপর হবেন না ব'লে তিনি কোনরকম আইন-কানুনের বন্ধনের মধ্যে থাকবেন না, অর্থাৎ তাঁর অধিকার হবে একচ্ছত্র। তবে প্লেটোর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যমণি হচ্ছে ন্যায়বিচার এবং এই ন্যায়বিচার হ'ল জ্ঞানের সক্রিয় রূপ। দার্শনিক-রাজা সক্রিয় জ্ঞানের প্রতিনিধি হওয়ায় স্বয়ং ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক হবেন। প্লেটোর মতে ন্যায়বিচারই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক গুণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ ও নারীর সম-অধিকার ইত্যাদি বহু প্রগতিশীল অভিমতের পৃষ্ঠপোষক হ'লেও প্লেটো তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পী বা সাহিত্যিকদের বিশেষ কোন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বাইবেলের আদর্শ সমাজ

মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন যীশুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিউ টেস্টামেণ্টে তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার বর্ণনা ক'রে গেছেন। খ্রীষ্টান ধর্মমতের এক মৌলিক আধার হচ্ছে মানুষের ভিতর পারস্পরিক অধিকারসাম্য। কারণ, সকলেই যখন ঈশ্বরের সন্তান তখন একে অপরের ভাই এবং ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদাভেদ খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তকের মতে অনুচিত। বাইবেলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয়েছে; কারণ বাইবেলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়-বিচার এবং ন্যায়বিচার পবিত্র কার্য ব'লে রাষ্ট্রও পুণ্য প্রতিষ্ঠান।

সম্পত্তির ব্যাপারে বাইবেল মোটামুটি সাম্যবাদের সমর্থক, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার বিরোধী। তবে বাইবেলকথিত সাম্যবাদ প্লেটোর আদর্শের মত বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। এই সাম্যবাদের আধার করুণা এবং প্রতিবেশীপরায়ণতা।

মুরের ইউটোপিয়া

যে কাল্পনিক গ্রন্থখানি সমাজ-পরিবর্তনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত রাজনীতিক এবং অপরাপর সকলের চিন্তা ভাবনা ও কর্মকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করেছে, নিঃসন্দেহে তা হ'ল ইংলণ্ডের স্যার টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রীঃ) লিখিত 'ইউটোপিয়া'। এই ব্যঙ্গ-রচনার লেখক অষ্টম হেনরীর সময়কার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থটি ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই রচনায় প্রধানতঃ তদানীন্তন সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ ক'রে মুর তাঁর সবপেয়েছির-দেশ বা ইউটোপিয়ার অবস্থা চিত্রিত করেন। মুর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও মুনাফা-বৃত্তির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে চোরকে শাস্তি দেবার পরিকল্পনা বৃথা; কারণ চৌর্যবৃত্তির জন্ম উপরি-উক্ত দুই বৃত্তি থেকে। মুরের আদর্শ সমাজের লক্ষ্য তাই উত্তম নাগরিক—বুদ্ধি এবং নৈতিক স্বতন্ত্রতার মূর্ত প্রতীক সৃষ্টি। সেই সমাজে আলস্যের স্থান নেই এবং অত্যধিক পরিশ্রম না ক'রেই সকলের যাবতীয় ঐহিক প্রয়োজনীয়তার সংস্থান হবে। বিলাস ও অপচয় ইউটোপিয়ায় বর্জিত; দারিদ্র্য ও সম্পদের প্রাচুর্য—দুই-ই নিয়ন্ত্রিত। লোভ ও শোষণবৃত্তির অবসান ঘটানোও মুরের কল্পনায় ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুরের লক্ষ্য ছিল এমন এক পূর্ণতায় উপনীত হওয়া যেখানে "মন মুক্ত স্বাধীন হয়ে সুসজ্জিত" রূপে অধিষ্ঠিত।

ভলটেয়ার

তদানীন্তন ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে অবিশ্রান্ত ভাবে তাঁর অগ্নিগর্ভ লেখনী চালনা করলেও সমগ্র মানব-

সমাজের মুক্তিপথ-যাত্রার ইতিহাসে ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রীঃ) তেজোময় বাণীর প্রভাব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ভলটেয়ারের মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে, প্রতিনিয়ত অবিরাম গতিতে আমাদের সমাজ ও তার সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অতএব সেই সময়কার স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রকে তিনি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা মনে না ক'রে তার পরিবর্তন-মানসে জনমত তৈরীর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এর জন্য তিনি পুরাণ ও ধর্মগুরুদের কুসংস্কারের প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রচার আরম্ভ করলেন। ফ্রান্সের সেই সময়কার অত্যাচারী শাসন-ব্যবস্থা ও দমন-মূলক আইন-কানুনকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনায় এই সব সংগঠনের অদৃশ্য আধ্যাত্মিক এবং মানসিক শক্তির প্রতি তিনি অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে ইতিহাসের ধারা ভূগোল বা অন্যবিধ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যতটা না চালিত হয়, তার চেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় মানুষের সচেতন কার্যকলাপ দ্বারা। ভলটেয়ার বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের ভিতর আত্মরক্ষার জৈব তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে অপর মানুষের হিতেচ্ছা-বৃত্তিও বিদ্যমান এবং এরই ফলে পরিবার ও সমাজ গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে ইতিহাসে উল্লিখিত সমস্ত জাতিই সমাজবদ্ধ জীব ছিল। ভলটেয়ার তাই সমাজ-সংগঠনকে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক জিনিস মনে করেছেন এবং তাঁর মতে সমাজের আদর্শ হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা করা। ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরীর দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বিচার এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ইত্যাদি এই স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্গত।

ভলটেয়ার রিপাবলিক ধরনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা যুক্তি দ্বারা স্বীকার করলেও বাস্তবে তা সম্ভব হবে ব'লে বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি ন্যায়বিচার ও আইন দ্বারা চালিত উদার রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ভলটেয়ারের রাষ্ট্রের লক্ষ্য

ছিল (১) সকল প্রজার সম-অধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা-বিস্তার, (২) আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গীর্জার একাধিপত্য নিয়ন্ত্রণ, এবং (৩) ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য করার প্রথা প্রবর্তন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যুক্তিবাদের পথিকৃৎ কেবল তাঁর সময়কার জনসাধারণকে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তীব্রভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন নি, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আমেরিকার বিপ্লবের শিক্ষা

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের অধিবাসিবৃন্দ আমেরিকায় গমন ক'রে বসতি স্থাপন করলেও আমেরিকা ইংলণ্ড দ্বারা শাসিত হ'ত। প্রথমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং রাজার নির্দেশাবলী আমেরিকা-বাসীরা নির্বিচারে মেনে নিলেও ক্রমশঃ ইংলণ্ডের শাসন আমেরিকাবাসীর আত্মমর্যাদা ও আর্থিক স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী হয়ে পড়েন। আবেদন-নিবেদনে কোন সুফল না হওয়ায় আমেরিকাবাসী অবশেষে (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করেন। এই বিপ্লবের ফলে আমেরিকা এক সুসংগঠিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আমেরিকার বিপ্লবের পিছনে কোন পূর্ব-নির্ধারিত রাজনৈতিক দর্শন ক্রিয়া করে নি। প্রয়োজনের তাগিদে তদানীন্তন নেতৃবর্গ ক্রমে ক্রমে এক গণতান্ত্রিক বিচারধারা ও মূল্যবোধ গ'ড়ে তোলেন। তবে আমেরিকার নেতৃবৃন্দের গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির মূলে জন লকের সামাজিক চুক্তির মতবাদ ক্রিয়াশীল ছিল। এ ছাড়া টমাস পেন এবং জেফারসনের আদর্শবাদী রচনাবলীও আমেরিকার বিপ্লব ও তার পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার কার্যে সম্যক্ প্রেরণা জুগিয়েছে।

আমেরিকার বিপ্লবের পিছনে ত্রিবিধ নীতি কাজ করেছে: (১) সম্পত্তির ব্যাপারে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার;

(২) প্রতিনিধিত্বের অধিকার না থাকলে কর দেবার দায়ও থাকবে না, এবং (৩) নিজেদের প্রতিনিধি ভিন্ন অপরের তৈরী আইন মানা হবে না। আমেরিকার বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের মতে আদিতে সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান ছিল এবং সকলের স্বাধীন থাকা ঐশ্বরিক বিধান। এর পর সামাজিক চুক্তির প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আমেরিকার নায়কেরা মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকারের ভিতর পরে নিজ নিজ পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জুরীর দ্বারা বিচারকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের মতে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব কম হওয়াই কাম্য। তাঁরা আরও প্রচার করেন যে, জনমতবিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানুষের কেবল অধিকারই নয়, কর্তব্যও বটে। আমেরিকার বিপ্লবের রূপকারগণ নানারকম বিধিনিষেধ (checks) দ্বারা সরকারের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন। লিখিত সংবিধান এই বিধিনিষেধের অন্যতম।

জেফারসনের মতে ভগবান মানুষকে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রের আদর্শ হচ্ছে এই লক্ষ্য পরিপূর্তিতে সহায়তা দান করা। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমেরিকার অধিকাংশ অঙ্গ-রাষ্ট্র তাদের সংবিধানে এক মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র (Declaration of Rights) যুক্ত করে। এতদনুযায়ী আমেরিকাবাসীর নিম্নোক্ত অধিকার স্বীকৃত হয়: (১) জীবন ধারণ, সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষা এবং সুখ শান্তি প্রাপ্তির প্রয়াস; (২) ইচ্ছামত ভগবদুপাসনা; (৩) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; (৪) গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে গ্রেপ্তার; (৫) কারণ দর্শাবার পর আটক রাখা; (৬) জুরীর সহায়তায় বিচার; (৭) নাগরিকদের ভিতর সমানাধিকার ইত্যাদি। আমেরিকার সংবিধানে দেশের জনসাধারণকে সার্বভৌম অধিকার দেওয়া হয়েছে, সুতরাং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, এমন কি শাসন করারও ক্ষমতা তাদের আছে। সরকারের কর্তৃত্ব আইন-সভা, প্রত্যক্ষ শাসন ও বিচার-বিভাগ—

এই ভাবে বিভক্ত ক'রে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। আইন-সভার সদস্য ও প্রত্যক্ষ শাসকদের পদ নির্বাচনমূলক ক'রে এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হয়। আমেরিকার সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানাবলীর উপর জোর দিয়ে সামরিক বিভাগকে অসামরিক বিভাগের অধীন করা হয়।

আমেরিকার বিপ্লবের উদার গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ এবং লিখিত সংবিধান, গণ-পরিষদ ইত্যাদি মানবজাতির ভিতর অধিকারসাম্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিতে কেবল উনবিংশ শতাব্দীতেই নয়, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কাছে এক আদর্শস্বরূপ বিরাজিত।

ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা

"সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা"—এই মহা-মন্ত্রের উদ্গাতা ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) মানুষের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ফরাসীবাসীরা ওই সময় কেবল ষোড়শ লুই-এর অত্যাচারী ও প্রজা-পীড়ক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বাস্তিল দুর্গই ভাঙেনি, ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে স্বৈরতন্ত্রী রাজাদেরও দিন শেষ হয়ে যায়।

ফরাসী বিপ্লবের মূলে রুসো, ভলটেয়ার, মণ্টেসকুই (Montesquieu), য়্যাবে সাইস (Abbe Sieyes) ও আমেরিকার বিপ্লবখ্যাত টমাস পেন প্রমুখ চিন্তানায়কদের বিচারধারা ক্রিয়াশীল। "সার্বভৌম জনগণের সম্মতির আধারবিহীন প্রত্যেকটি সরকারই বেআইনী"—রুসোর এই বলিষ্ঠ উক্তি ফরাসী বিপ্লবের রূপকারদের উদ্দীপ্ত করে। তদানীন্তন ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী বৃত্তির প্রতি কটাক্ষ ক'রে য়্যাবে সাইস ঘোষণা করেন, "যারা বিশেষ সুবিধাভোগী, অর্থাৎ আইন-কানুন যাদের জন্য নয়, তারা নিজেদের জাতির অঙ্গ ব'লেও মনে করতে পারে না।" টমাস পেনের মতে, "সমাজের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অভাব পূরণের জন্য এবং সরকারের জন্ম আমাদের

শঠতা থেকে। সমাজ আমাদের স্নেহবন্ধনকে একত্রিত ক'রে বিধায়ক দৃষ্টিতে সুখবৃদ্ধি করে; কিন্তু সরকারের কাজ নেতিমূলক, অর্থাৎ আমাদের অন্যায় আচরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। সকল রাষ্ট্রেই সমাজ মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ; কিন্তু সরকারের চূড়ান্ত ভাল রূপও অপরিহার্য পাপ (necessary evil) ছাড়া আর কিছু নয়। এক অর্থে সরকার ও আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম-অর্থদ্যোতক। উভয়ই আমাদের বিলুপ্ত সারল্যের প্রতীক।" পেন বলেন, "সকল মানুষই এক প্রকারের এবং তাই তারা সমান হয়ে সম-অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে"। তাঁর মতে, মানুষ রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে, "পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প অধিকারে সন্তুষ্ট থাকার জন্য নয়, পূর্বের অধিকারাবলীর অধিকতর নিরাপত্তা" সরকার কর্তৃক সাধিত হবে—এই বিশ্বাস মানুষের মনে ক্রিয়া করছে ব'লেই তার রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রয়াস। পেন সরকারের প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব হ্রাস ক'রে সমাজের গুরুত্বের গুণগান ক'রে গেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সমাজে সরকারের অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা স্বল্পমাত্রায় পরিদৃশ্যমান। মানুষের অধিকার বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কোচনের প্রয়োজনীয়তা। এই সব কারণে পেন ও ফরাসী বিপ্লবের অন্যান্য পুরোধাগণ লিখিত সংবিধানে সরকারের সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ ক'রে রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেন।

আমেরিকার বিপ্লবের মতই ফরাসী বিপ্লবের শেষে বিপ্লবীদের আদর্শ রাজনৈতিক দর্শনের মূল নীতিসমূহ দেশের আইনে পরিণত হয়। আমেরিকার মতই ফ্রান্সেও মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র রচিত হয়। এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ মানবের মুক্তিপথযাত্রায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে: (১) মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন ও সকলেরই সমান অধিকার; (২) যে-কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সংগঠনকে মানুষের স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার—যথা, স্বাধীনতা, শরীর ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধের অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে হবে; (৩) আইনের চক্ষে সকলে সমান, অর্থাৎ ন্যায়ের দণ্ড কেউ এড়াতে পারবে না; (৪) স্বয়ং বা প্রতিনিধির দ্বারা সবাই দেশের আইন প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

ফরাসী বিপ্লবের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ভিতর একাধিক সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছিল। সময়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝে মাঝে মাঝে এর অনেক রকম রদ-বদল হ'লেও সাইস ও কনডরেক্ট (Condorect) কর্তৃক প্রচারিত নিম্নোক্ত মূলনীতি মোটামুটি তখনকার সংবিধান-গুলির অঙ্গীভূত হয়েছিল: (১) জনগণের অধিকার এক মৌলিক বস্তু, সুতরাং অভিজাতদের বিশেষাধিকার পরিত্যাজ্য; (২) শাসন-যন্ত্র জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, অতএব সর্বসাধারণের মতদান বা ভোটের অধিকার কাম্য; (৩) সরকার এবং আইন-পরিষদ দেশের সংবিধানের অধীন, কিন্তু জাতি সংবিধানেরও উর্ধ্বে। সংবিধানের সংশোধন বা পরিবর্তন করার অধিকার সরকারের নেই, এ ক্ষমতা আছে জাতির; (৪) প্রত্যেকটি মানুষের কতকগুলি পবিত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে, কোন সরকার বা রাষ্ট্র এতে হস্তক্ষেপ বা এর দলন করতে পারে না।

পরবর্তীকালে ফ্রান্সে বিপ্লবের আদর্শ বিকৃত হয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে ফরাসী বিপ্লবের মূল দর্শন অদ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

জার্মানীর ভাববাদী দর্শন—কাণ্ট

সমসাময়িক কালের জড়বাদী যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জার্মানীতে ভাববাদী (Idealist) দর্শনের সূত্রপাত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ই ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ) জার্মানীর বিশিষ্ট দার্শনিক রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কাণ্ট তাঁর দুই পূর্বসূরী রুসো এবং মণ্টেসকুই-এর কাছে তাঁর ভাবধারার জন্য বিশেষ

ভাবে ঋণী। কাণ্টের মতে মানুষ স্বভাবতঃ স্বাধীন ও সমান এবং রাষ্ট্র মানুষের পারস্পরিক চুক্তি থেকে উদ্ভূত। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি-মানব তার অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ সমগ্র জনসাধারণের কাছে ন্যস্ত ক'রে থাকে। জনসাধারণই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত বিধান রচনাকারী এবং জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছা আইন-কানুনের মূলাধার। কাণ্টের মতে স্বাধানতা সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসন—এই দুই বিভাগকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। সরকার স্বৈরতন্ত্রী, অভিজাততন্ত্রী বা গণতান্ত্রিক—যে কোন রকমের হতে পারে। তবে আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগ পৃথক্ হ'লে সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে প্রজাতান্ত্রিক, আর তা না হ'লে স্বৈরতন্ত্রী বলতে হবে। যুক্তিবাদ-আশ্রয়ী শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। তবে রাজা, অভিজাতবর্গ বা পরিষদ-সদস্য প্রভৃতি যে-কেউ এই প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কাণ্ট গণ-বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে বৈধানিক উপায়ে শাসনসংস্কার করাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

কাণ্টের রাজনীতি নীতিধর্ম-ভিত্তিক। তাঁর মতে কেউ "নৈতিক ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য" ভোগ করলেই স্বাধীন মানুষের পদবাচ্য। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে বিশ্বজনীন বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্য এবং এর জন্য অপর সকলের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্মান ও রক্ষা করতে জানা চাই। কাণ্টের মতে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কাণ্টের ভাববাদ বলে যে, নীতিধর্ম, আইন বা রাজনীতি—সব কটির মূলেই রয়েছে পরিপূর্ণ সত্য। কাণ্ট মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার (free will) শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। কাণ্ট আন্তর্জাতিকতার পূজারী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, শেষ পর্যন্ত মানবসমাজকে এক বিশ্বরাষ্ট্রের আওতায় সম্মিলিত হতে হবে। ব্যক্তিবাদী কাণ্ট রাষ্ট্রের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে তাকে ব্যক্তি-মানুষের নৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে দেবার বিরোধী ছিলেন। তবে মানুষ অহং-ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতা, লাভ ও গৌরবের লোভ দ্বারা আচ্ছন্ন ব'লে রাষ্ট্রকে বাধ্য

হয়ে সমাজে শান্তি কায়েম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দমননীতির শরণ নিতেই হয়।

হেগেল

জর্জ উইলহেলম ফ্রেড্রিক হেগেলকে (১৭৭০-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) জার্মান ভাববাদীদের শীর্ষস্থানীয় আখ্যা দেওয়া যায়। হেগেলীয় পদ্ধতির মূলাধার হচ্ছে উদ্বর্তন (Evolution)। হেগেলের মতে ভাবজগতের এই উদ্বর্তন দ্বান্দ্বিক (Dialectical) প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। হেগেলের দৃষ্টিতে সমগ্র ইতিহাস উদ্বর্তন-আধারিত ধাপে ধাপে বিকাশের কাহিনী। এর প্রতিটি যুগ আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং সেইযুগের যাবতীয় সংগঠনে এর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্বর্তনমূলক বিকাশের কারণ হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ভাবের (Idea) ভিতর তার বিরোধী তত্ত্বও বিদ্যমান, ফলে প্রকৃতির সর্বত্র স্ববিরোধ রয়েছে। তবে এই স্ববিরোধ কদাপি পরম (Absolute) বা পরস্পর-বিধ্বংসী নয়। বিপরীত তত্ত্বের প্রভাবে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পরিণামে নব নব ভাবের বিকাশ হয়। হেগেলীয় দর্শন নিম্নোক্ত ত্রিবিধ আধারের উপর স্থাপিত: (১) যাবতীয় জৈব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক নীতিমূলক; (২) বাস্তবতা এক জৈব প্রক্রিয়া; এবং (৩) বাস্তবতার অস্তিত্ব ভাবজগতে।

প্রাচীনকালের গ্রীকদের মত হেগেলও বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিমানব তার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা খুঁজে পাবে রাষ্ট্রের আওতায়। সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রুসো, ভলটেয়ার বা জেফারসন ও টমাস পেনের মত তিনি মানুষের কোন স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র কেবল সমাজের স্বাধীনতাকে বজায় রাখে না, এর বৃদ্ধিও ঘটায়। ব্যক্তি-মানব তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানাবলী ও পরিবেশের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলে। হেগেল স্বভাবতঃই

সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টির মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র এক স্বাভাবিক জৈব সত্তা (Natural organism) এবং যাবতীয় জৈব প্রক্রিয়ার মত রাষ্ট্রের বিকাশও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হয়েছে। অতএব রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। হেগেলের রাষ্ট্র সর্বব্যাপী, অভ্রান্ত এবং শেষ সত্য। রাষ্ট্রকে নিছক সাধন (Means) বলে স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁর কাছে রাষ্ট্রই সাধ্য বা চূড়ান্ত লক্ষ্য (End)। এ হচ্ছে "ঈশ্বরের এই ধরাতলে চরণপাতের" প্রতীক। স্বাধীনতা রাষ্ট্রের কাম্য হ'লেও আইন-কানুনের সহায়তা ব্যতিরেকে এর পরিপূর্তি অসম্ভব। সুতরাং তিনি মানবীয় অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব বা কাণ্টীর আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ছিলেন।

রাজনৈতিক দর্শনের উপর হেগেলের অসীম প্রভাব। তাঁর রাষ্ট্রকে সর্বেসর্বা করার বিচারধারা ফ্যাসিস্টরা গ্রহণ করে এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে মার্কসের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা আত্মসাৎ করে। তবে মার্কসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া জড়বাদ-আধারিত, হেগেলের মত ভাববাদ-নির্ভর নয়।

"বহুজনহিতায় চ"—বেন্থাম

"বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ" এই মহাজন বাক্যকে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি বিশিষ্ট দর্শনের রূপ দেন ইংলণ্ডের ইউটিলি-টারিয়ানরা (Utilitarian)। "সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির অধিকতম কল্যাণ"—এই সূত্র প্রথম ঘোষিত হয় ফ্রান্সিস হাচিসন (Francis Hutcheson) দ্বারা। ইউটিলিটারিয়ান দর্শনের সার পূর্বোক্ত সূত্রের ভিতর নিহিত। ইউটিলিটারিয়ানদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক প্রাণী এবং কোন কর্মে তার আত্মনিয়োগের প্রেরণা হচ্ছে সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার তাগিদেই তার সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে ও এই জন্য মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে আইন-কানুনের মাধ্যমে

হস্তক্ষেপ করতে হয়। ইউটিলিটারিয়ানদের মতে সকল মানবের ভিতর আত্মমুখী বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পরার্থপর বৃত্তিও বিদ্যমান। মানুষের আচরণে আবেগ (Emotion) সমূহের পরিতৃপ্তির ইচ্ছা যতটা বলবতী, যুক্তিশীলতাও ঠিক ততটা প্রবল। মানুষ স্বার্থকে পরার্থের কাছে বলি দিয়ে থাকে। বেন্থামের মতে মানুষ আইন, জনমত এবং ধর্ম ইত্যাদি শক্তির কারণে সর্বসাধারণের সুখের ভিতর নিজের সুখের সন্ধান পায়। ইউটিলিটারিয়ানদের মতে আনন্দই মানুষের চরম লক্ষ্য এবং কাম্য। তবে সমাজে এই আনন্দ প্রাপ্তির পথ আইন ও প্রথা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্য সুখের সঙ্গে আইন-কানুন রচনা ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের গভীর সম্বন্ধ। ইউটিলিটারিয়ানরা রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সংমিশ্রণের পক্ষপাতী।

জেরিমি বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ) পূর্বেই ইউটিলিটারিয়ান মতবাদের অস্তিত্ব থাকলেও তাঁকেই প্রত্যুত এই দর্শনের বিধিবদ্ধ প্রবক্তা আখ্যা দেওয়া উচিত। বেন্থাম বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রের সত্যকার আদর্শ হচ্ছে অধিকতম সংখ্যকের হিতসাধন। রাষ্ট্র ভাল কি মন্দ বিচার করার এই হচ্ছে মানদণ্ড। কোন দেশের প্রচলিত আইন-কানুন বা সামাজিক সংগঠন ও প্রথাকে অতীতের মাপকাঠিতে নয়, বর্তমান প্রয়োজনীয়তার বিচারে মাপা উচিত। বেন্থাম রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাপারে সামাজিক চুক্তির মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণ হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা বা কল্যাণসাধনের ক্ষমতা। মানুষের আইন-কানুন ও রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা জানে যে, "এই রকম আনুগত্যের সম্ভাব্য দোষ-ত্রুটীর চেয়ে আনুগত্য স্বীকার না করার দোষ-ত্রুটী অনেক বেশী।" বেন্থাম সকল পুরুষের ভোটাধিকার, বৎসরান্তে ব্যালট প্রথা বা গোপন মতদান প্রথা দ্বারা পার্লামেন্টের নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সেকালের দাবি অবাধ ব্যবসায়েরও (*laissez faire*) সমর্থক ছিলেন। বেন্থাম বিচার-ব্যবস্থাকে রাজনীতি থেকে পৃথক্ করার

কথা বলেন এবং শাস্তিদান প্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, জনকল্যাণ সাধনে সমর্থ না হলে এ নিরর্থক। নিঃসন্দেহে এ এক বৈপ্লবিক বিচারধারা।

জন স্টুয়ার্ট মিল

বেন্থাম বা জেমস মিল এবং অস্টিন প্রমুখ ইউটিলিটারিয়ানদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে মতসাদৃশ্য না থাকলেও জন স্টুয়ার্ট মিলকে (১৮০৬-৭৩) এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবক্তা রূপে স্বীকার করা হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "অন লিবার্টি" নামক গ্রন্থ আজ পর্যন্ত মানব-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিচারধারার এক বলিষ্ঠ বুনিয়াদ রূপে আদৃত। মিল স্বাধীনতাকে এক পবিত্র ব্যক্তিগত অধিকার বলে মনে করতেন। কোন একজন মানুষের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমস্ত জগতেরও পদদলিত করার অধিকার নেই—এই মর্মে তাঁর ঘোষণা চিরকাল মানব মুক্তি-কামীদের আদর্শরূপে পরিগণিত হবে। বলা বাহুল্য, মিলের এই বিচারধারা সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির অধিকতম কল্যাণনীতির সঙ্গে খাপ খায় না। অপরাপর ইউটিলিটারিয়ানদের মত মিলও বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের সৃষ্টি কোন চুক্তির ভিত্তিতে হয় নি। তাঁর মতে সামাজিক হিতের জন্যই সরকারের জন্ম। রাজনৈতিক সংগঠন-সমূহের আধার মানবের ইচ্ছাশক্তি ও আগ্রহ। জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতাই হচ্ছে সরকারের কর্তৃত্বের বুনিয়াদ। সরকারের আদর্শ হচ্ছে ব্যক্তি-মানবের ভিতর সদ্‌গুণ ও বুদ্ধির সৃষ্টি করে সমাজের হিতসাধন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মিল মানুষের স্বাধীনতার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তি-মানবের ক্রিয়াকলাপের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ন্যূনতম হওয়া উচিত। মৌলিক চিন্তা, আচরণ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে তিনি সামাজিক প্রগতির মূলাধার বলে বর্ণনা করে গেছেন। সেইজন্য মানুষের বিকাশ ব্যক্তিগত

ধারায় হওয়া প্রয়োজন। তবে এর জন্য ব্যক্তি-মানবের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হলে চলবে না। ব্যক্তিগত বিকাশের ফলে বহু বিচিত্র চারিত্রবৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়ে বিশ্ব সমৃদ্ধ হয় বলে মিল প্রথম দিকে রাষ্ট্রচালিত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কারণ রাষ্ট্রচালিত শিক্ষার পরিণামে ছাঁচে ঢালা মানুষ তৈরী হয়। নিঃসন্দেহে মিলের এই বিচারধারাকে অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে স্বীকার করতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা রূপে মিলের নাম আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতা চাইলেও মিল এর উপর দ্বিবিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথমতঃ, নিজের স্বাধীনতার নামে কেউ অপরের ক্ষতি করতে পারবে না; দ্বিতীয়তঃ, সমাজের যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য সে অপর সকলের সঙ্গে পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মিলের আদর্শ শাসন-ব্যবস্থার আওতায় সর্বসাধারণের হাতে বৈধানিক সার্বভৌমত্ব থাকাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য সকলকে অন্ততঃ মাঝে মাঝে কোন প্রত্যক্ষ সার্বজনীন কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

মিলের এই বিচারধারাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা চলে। মিল মনে করতেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা সংখ্যাধিক্য তত্ত্বের প্রতি অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে এবং এর ফলে গড়পড়তা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জোট সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মিল সর্বসাধারণকে ভোটাধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষিতদের জন্য একাধিক ভোট থাকা উচিত বলে মনে করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর পীড়ন না করে মিল সেইজন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) সমর্থক ছিলেন। আর একটি ব্যাপারে মিল এক বৈপ্লবিক প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যদের বেতন দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

ইউটিলিটারিয়ান বিচারধারার প্রগতির ফলে ভাববাদীদের

রাষ্ট্রকেই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান মনে করার দর্শনের প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফল স্বরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রী হবার পথ ছেড়ে আবার ব্যক্তি-মানবের কল্যাণমুখী হবার পথে মোড় ফেরে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূলে ইউটিলিটারিয়ানদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপাসনার বৃত্তি কাজ করছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Republic — প্লেটো

Elements of Political Science — অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ সুদ

History of European Political Philosophy — অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারী

A History of Political Theory — জর্জ স্যাবিন

On Liberty — জন স্টুয়ার্ট মিল

॥ ৪ ॥

সমাজবাদের জন্ম ও বিকাশ

সমাজবাদের সূত্রপাত

মানবের মুক্তিযাত্রায় সমাজবাদের বিচারধারা ও কর্মসূচী এক বলিষ্ঠ ও সুপরিণত ধাপ। বলা বাহুল্য, এই রকম একটি মহৎ বিচারধারাকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া ব্যাপার বলা চলে না। মানবীয় মূল্যবোধ সমাজে স্থাপনা করার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ বহু মনীষী ও কর্মযোগীর মানবকল্যাণ সাধনের দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রযত্নের পরিণাম।

আধুনিক সমাজবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তার উদ্ভবের পটভূমিকা জেনে রাখা ভাল। এ যুগের সমাজবাদ মূলতঃ শিল্প-বিপ্লবের (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিলেও, ফরাসী বিপ্লবের সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি কেড়ে নেবার দৃষ্টান্তও সমাজবাদের মালিকানা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণের বিকাশের পিছনে ক্রিয়া করেছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানুষ বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভোগ্য উপকরণ উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে ফেললেও এর পরিণামে বহুবিধ আর্থিক ও সামাজিক কুপরিণাম দৃষ্টিগোচর হল। কারখানায় উৎপাদন-প্রথা চালু হবার পর ধনীরা আরও ধনী এবং গরিবরা আরও গরিব হতে লাগল। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ গভীরতর হল। কৃষিনির্ভর জনসাধারণ গ্রাম ছেড়ে কারখানার আশেপাশে একত্র হতে লাগল ও এইভাবে শারীরিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাস্থ্যকর বস্তি ও শহরের জন্ম হল। অনিয়ন্ত্রিত মুনাফার লোভে মানুষকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হতে লাগল, এমনকি নারী ও শিশুদের কারখানা ও খনির বিপজ্জনক কাজে লাগানো হল। এত পরিশ্রম করেও কিন্তু শ্রমিকদের পেট ভরত না। এদিকে শ্রমিক-আন্দোলন তখন সংগঠিত ছিল না এবং ইউরোপ, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের উদীয়মান পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে চালিত সরকার স্বভাবতঃই মালিক ও

মজুরদের বিরোধে প্রথমোক্তদেরই সমর্থন করত। এর উপর রিকার্ডোর মত অর্থশাস্ত্রী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা প্রচলিত পুঁজিবাদের গুণগান করতে লাগলেন। স্বভাবতঃই মানুষ এই সংকটজনক অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজছিল। তার থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবান্বিত দেশসমূহে আধুনিক সমাজবাদের জন্ম হল।

ইউটোপিয়ান সমাজবাদ—সিসমন্দি

এঙ্গেলসের মতে, মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজবাদী—যথা, ফ্রান্সের সিসমন্দি, সেণ্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ার এবং ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন প্রভৃতির সমাজবাদ ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক। টমাস মুরের ‘ইউটোপিয়া’ নামক গ্রন্থে যে কল্পিত স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা আছে তার থেকেই এঙ্গেলস এই নামটি গ্রহণ করেন। এঙ্গেলসের মতে মার্কস্‌বাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ। এঙ্গেলসের এ দাবি বর্তমানে অনেকেই মেনে না নিলেও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সমাজবাদের ধারাকে মার্কসের পূর্ববর্তী এবং মার্কস ও তাঁর পরবর্তী এই দুই বিভাগে বিভক্ত করব।

কাল্পনিক সমাজবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক অন্যায় দূর হলেই রাজনৈতিক অন্যায় বিদূরিত হয়। তাঁরা সম্পত্তির মালিকানাকে সামাজিক পাপ বলে মনে করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাকে ও অনুপার্জিত সম্পদ্‌ এবং প্রচলিত পুঁজিবাদকে মানুষের দারিদ্র্যের কারণ বলে বিবেচনা করতেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অনিয়ন্ত্রিত অবাধ অধিকার চলত, তা তাঁদের দ্বারা ধিকৃত হয়েছিল।

ফ্রান্সের জাঁ দ্য সিসমন্দিকে (Jean de Sismondi) এই বিচারধারার অগ্রদূত বলা যায়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিসমন্দির ‘নিউ প্রিন্সিপল্‌স্‌ অফ পলিটিক্যাল ইকনমি’ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ পুঁজিবাদের সমর্থক

অর্থশাস্ত্রীদের অবাধ অধিকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। য়্যাডাম স্মিথের মত জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি সিসমন্দির লক্ষ্য ছিল না; তিনি কামনা করতেন জাতীয় সুখের বৃদ্ধি। তবে তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বা ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা রদ করার সপক্ষে ছিলেন না। তিনি আর্থিক ক্ষেত্রে অবাধ নীতির তীব্র বিরোধী হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সরকার কর্তৃক জাতীয় সম্পদের বণ্টন অধিকতর ন্যায়সংগত ভিত্তিতে করার বেশী অগ্রসর হয় নি। সিসমন্দির মতে, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর কখনও সদ্ভাব থাকতে পারে না; এ ছাড়া পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন ও তজ্জনিত নানাবিধ জটিলতা দেখা দিতে বাধ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজ-ব্যবস্থায় দুর্বল শ্রমিকরা সবল মালিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, অতএব সমাজ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের এই সব ত্রুটী সংশোধন করার জন্য সিসমন্দি এক জাতীয় শ্রমিক বীমার প্রস্তাব করেন। এর ফলে শ্রমিকরা নিয়মিতভাবে জীবননির্বাহের ব্যয় পাবে বলে তিনি আশা করতেন। এ ছাড়া তিনি মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকারও দাবি করেছিলেন। বালক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা, সাপ্তাহিক ছুটি, কাজের সময় নির্ধারণ ইত্যাদির প্রস্তাবও সিসমন্দির দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি শ্রমিক-আন্দোলন ও সংগঠনের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সব উদারপন্থী সমাজ-সংস্কারক সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের দাবি করতেন, সিসমন্দিকে তাঁদের পথপ্রদর্শক বলা যায়।

সেণ্ট সাইমন

ফরাসী দেশের সেণ্ট সাইমনকে (১৭৬০-১৮২৫) বিধিবদ্ধ-ভাবে সমাজবাদের আলোচনাকারীদের মধ্যে সর্বপ্রাচীনের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁকে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের জনকও বলা

চলতে পারে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ থেকে ধর্মাশ্রিত নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে যাবার দরুন এর পরিবর্তে এক সদর্থক (positive) নৈতিকতার শরণ নেওয়া উচিত। আর এই নবীন নৈতিকতার আধার হবে শিল্প বা উদ্যোগবাদ। সেণ্ট সাইমনই সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি ওই কালকে সংগঠনের যুগ বলে অভিনন্দিত করেন। সাইমন "যোগ্যতা" ও কাজের ভক্ত এবং অযোগ্যতা, কৃষিমূলক জীবনযাত্রার গতানুগতিকতা ও আলস্যের প্রচণ্ড সমালোচক ছিলেন। রাজনীতিবিদ্, পুরোহিত এবং অভিজাত সম্প্রদায় প্রমুখ অনুৎপাদক শ্রেণীর প্রতি তিনি মনেপ্রাণে বিরূপ ছিলেন। তাঁর মতে সমাজে এক মাত্র উৎপাদক শ্রেণীরই প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং শ্রেণী-বৈষম্য দূর করার অর্থ হচ্ছে একটি মাত্র অর্থাৎ উৎপাদক শ্রেণীকেই থাকতে দেওয়া। সেণ্ট সাইমনের আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক নব-বিধানে উৎপাদকদেরই রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকবে। এ ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থান থাকলেও চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে পার্লামেণ্টের হাতে। এর ভিতর ইঞ্জিনিয়ার, কবি, চারুশিল্পী প্রভৃতি "আবিষ্কারক", পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ প্রভৃতি "পরীক্ষক" ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্ণধার ইত্যাদিদের স্থান থাকবে।

সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ওই অতদিন পূর্বেও অতীব স্বচ্ছ ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সম্পত্তির স্বত্ব জন-সাধারণের মতসাপেক্ষ এবং সামাজিক প্রয়োজনে তার রদবদল হতে পারে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি মানুষের প্রচেষ্টা বা পরিশ্রমের পরিণাম না হয়, তবে তাকে শোষণ আখ্যা দিতে হবে। সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষ চলছে, এ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সাইমন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক কল্যাণের নিমিত্ত উৎপাদকদের স্বার্থকে উপভোক্তাদের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিত। তাঁর আর একটি অভিমত হচ্ছে, "সমাজের বৃহত্তম অংশের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সমাজ গড়ে তুলতে হবে।" তবে তিনি

পরিশ্রমের হিসাব না করে সকলকে সমান লাভ দেবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। 'নিউ ক্রিশ্চিয়ানিটি' নামক গ্রন্থে তিনি প্রচলিত ধর্মের পরিবর্তে নূতন নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি এর লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করেন।

সাইমনের শিষ্যরা তাঁর মতবাদ অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেন এবং তাঁরা যৌথ জীবনের সমর্থক ছিলেন। তবে তখনকার শাসকরা তাঁদের প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ায় তাঁরা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি।

ফুরিয়ার

সেণ্ট সাইমন শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদীয়মান শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও ইঞ্জিনিয়ারদের পরিত্রাতা রূপে বন্দনা করলেও চার্লস ফুরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭) কিন্তু ওইখানেই থেমে যান নি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে সব কৃষক ভূমি থেকে উৎখাত হচ্ছে, যে সব শিল্পী ও কারিগর তাদের আবহমান কালের বৃত্তি থেকে চ্যুত হয়ে অনাহার ও মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে, কাঙালের বন্ধু চার্লস ফুরিয়ার ছিলেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ-বেদনার মূর্ত প্রতিরূপ। সেণ্ট সাইমনের মত তিনি কেবল যোগ্যতাপ্রেমী ছিলেন না। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমবণ্টনেরও সমর্থক ছিলেন। তাঁর আদর্শ সামাজিক সংগঠনকে তিনি ফ্যালাঞ্জে (phalange) নামে অভিহিত করেছেন। এখানে এক দলের পরিশ্রমের ফল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগ করার উপায় নেই। সেখানে প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে এবং সকলেই পরিণামে আনন্দ ভোগ করবে। এই সমবায়মূলক স্বাবলম্বী ও স্বরাট্ সমাজে "যদি পনের শ লোক থাকে, তা হলে তার মধ্যে কয়েক শ চাষ-আবাদ করে সকলের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শাক-শব্জী উৎপন্ন করবে, কয়েক শ তাঁতে কাজ করে সমগ্র সমাজের পরিধেয় উৎপাদন করবে। সমগ্র সমাজের সর্বপ্রকার ক্রিয়া-কলাপই

সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং কাজে যাতে একঘেয়েমি না আসে, তার জন্য মাঝে মাঝে পেশার পরিবর্তন করে দিতে হবে।" ফুরিয়ারের লক্ষ্য ছিল কাজকে মনোরম ও আনন্দদায়ক করা এবং এর জন্য মানুষের নিম্নোক্ত তিনটি স্পৃহাকে ভিত্তি করে তিনি অগ্রসর হবার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন : (১) মানুষের বৈচিত্র্যস্পৃহা ও পরিবর্তনের স্বাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা, (২) মানুষের রোমাঞ্চপ্রীতি ও অনুকরণেচ্ছা, এবং (৩) সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার অভিলাষ। ফুরিয়ারের এইসব ফ্যালাঞ্জে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং ফ্যালাঞ্জেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ফেডারেশনের নীতির আধারে যুক্ত থাকবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল। তবে শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে মানুষ হলেও ফুরিয়ার সাইমনের মত শিল্প-সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক না হয়ে কৃষি-সভ্যতাপ্রেমী ছিলেন।

ফুরিয়ার বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রমিকদের পুঁজি বিনিয়োগ-কারীতে রূপান্তরিত করতে না পারলে এবং কঠিন ও আকর্ষণবিহীন কাজের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক না দিলে শ্রমের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে না। ফ্যালাঞ্জের ভিতর তাই পুঁজিপতি, শ্রমিক এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিশিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি সকলেরই স্থান ছিল। সকলেই সমাজের উৎপাদন কার্যে ভাগ নেবেন এবং কর্ম বিভাজনের ফলে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সকলেই ফ্যালাঞ্জের অংশীদার হবেন—শ্রমিকদের ৫/১২, পুঁজিপতিদের ৪/১২ এবং ব্যবসায়ীদের ৩/১২ অংশ থাকবে। পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রত্যেককেই ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে এবং সকলেরই নিজ রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার থাকবে।

ফুরিয়ারের বিচারধারা, বিশেষতঃ নারীদের অধিকার সংক্রান্ত তাঁর অভিমত, জন স্টুয়ার্ট মিলকে প্রভাবিত করে। শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার-কার্যেও তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন।

ওয়েন

সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী মানুষের স্বভাব ও চরিত্রগঠন কার্য বহুলাংশে প্রভাবিত করে—আধুনিক সমাজবাদের এই সিদ্ধান্ত প্রবর্তনের মূলে রয়েছেন ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)। 'নিউ ভিউ অফ সোসাইটি' নামক গ্রন্থে ওয়েন তাঁর এই বিচারধারা ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের স্বভাব ও চরিত্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর গঠনে পরিবেশ সবচেয়ে বেশী কাজ করে। ভাষা, দেশ, ধর্ম, জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ—এ সব-কিছুরই প্রভাব ওয়েন-কথিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে। তিনিই সর্বপ্রথম জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেন যে, সামাজিক পটভূমিকা ব্যতিরেকে মানুষকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, এবং শত শত বৎসরের সামাজিক সাধনার রসে পরিপুষ্ট হয়ে তবেই মানুষ আধুনিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, "ভাল-মন্দ বিজ্ঞ-মূর্খ—সমস্তই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এর জন্য এমনকি সমগ্র বিশ্বকেও দায়ী করা চলে।" ওয়েন বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ মূলতঃ সৎ এবং সামাজিক অন্যায় বা অবিচার যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিণাম। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্মই পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত করার মূল কারণ।

সমাজবাদী জগতে ওয়েনের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য দান আছে। স্বয়ং কারখানার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনিই সর্বপ্রথম গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলন ও ক্রেতা সমবায় সমিতির সূত্রপাত করেন। শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে শ্রমজীবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজ দাবি আদায় করার প্রযত্ন করে এবং সমবায় সমিতির দ্বারা তারা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার শিক্ষা পায়। মালিক ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আধারে পরিচালিত না করে তিনি সমবায় নীতির শরণ নেবার প্রস্তাব করেন। ওয়েনপন্থীদের প্রচেষ্টার ফলে তদানীন্তন ইংলণ্ডে বহুবিধ শ্রমিক-কল্যাণ আইন রচিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের জন্য শিল্প-বিদ্যালয় এবং অ-প্রাপ্তবয়স্কদের

জন্য পাঠশালা স্থাপন করা ওয়েনপন্থীদের আর এক কৃতিত্ব। দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিয়োগ না করা এবং সকল শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস করার প্রস্তাবও ওয়েন করেছিলেন।

'দি বুক অফ নিউ মরাল ওয়ার্লড' পুস্তকে ওয়েন বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। প্রত্যেক মানুষকে তার শ্রমের পূর্ণ ফল দিয়ে তাকে ভাড়াটে শ্রমিকের পরিবর্তে মালিকে রূপান্তরিত করা এর মধ্যে অন্যতম। সমাজ থেকে নিষ্কর্মা ব্যক্তিদের অপসারিত করে উৎপাদক সঙ্ঘ স্থাপনা করা তাঁর আর-একটি মৌলিক বিচার। পণ্য বিনিময়ের জন্য তিনি তার আর্থিক মূল্যের হিসাব করার পরিবর্তে শ্রমকে আধার জ্ঞান করার পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনের জন্য যতটা শ্রম লেগেছে তার ভিত্তিতে হোক—এই ছিল তাঁর দৃষ্টিকোণ।

ওয়েন বহুসংখ্যক আদর্শ সামাজিক সংগঠনের একক্ (unit) গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এর অধিবাসী-সংখ্যা হবে ৫০০ থেকে ৩০০০ এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই সব নূতন জনপদ গড়ে উঠবে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঞ্চালনের জন্য এই সমস্ত জনপদে যে কাউন্সিল গঠিত হবে তার সদস্যবর্গের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বৎসর হবে। তবে অন্যান্য ওই-জাতীয় সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গঠিত কাউন্সিলের সদস্যদের বয়স অন্ততঃ ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে হওয়া চাই। ওয়েনের প্রচেষ্টায় এরকম অনেক আদর্শ সমাজের একক্ গড়ে উঠেছিল।

শ্রমিক ও সমাজের উপর ওয়েনের প্রভূত প্রভাব থাকলেও মালিক বা মধ্যবিত্ত সমাজে তিনি অপাঙ্ক্তেয় ছিলেন। তাঁর শ্রমিক সংগঠন ও ধর্মযাজকদের প্রতি আক্রমণ ইত্যাদিকে এঁরা ভাল চোখে দেখেন নি।

লুই ব্ল্যাঙ্ক

রাষ্ট্রের কাছ থেকে কাজের নিশ্চয়তা দাবি করা আধুনিক সমাজবাদের এক সর্বজনমান্য নীতি। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ফরাসী দেশীয় লুই ব্ল্যাঙ্কই (১৮১১—১৮৮২) সর্বপ্রথম সমাজের কাছে এই বিচারধারা উপস্থাপিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল বৈপ্লবিক আলোড়নের কাল। নূতন আশা ও নবীন উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলাও সেদিন ফরাসী সমাজে দেখা দিয়েছিল। সেই সংকট-মুহূর্তে ব্ল্যাঙ্ক শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, তারা যেন ধনীদের মুখাপেক্ষী হয়ে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে নিজেরাই কল-কারখানা গড়ে তোলে। পুঁজির সমস্যা দেখা দিলে তিনি এর সমাধান স্বরূপ বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রই হবে দরিদ্র জনতাকে পুঁজি-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। লুই ব্ল্যাঙ্কের এই ঘোষণায় সমাজবাদের এক মৌলিক ভিত্তি রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগের ইঙ্গিত রয়েছে। এ ছাড়া এও বোঝা যায় যে, তিনি ফুরিয়ার বা রবার্ট ওয়েনের মত রাষ্ট্র সম্বন্ধে নির্বিকার বা সাইমনের ন্যায় রাষ্ট্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। বস্তুতঃ ব্ল্যাঙ্ক স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, "রাজনৈতিক কার্য-কলাপের মধ্য দিয়েই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" তাঁকে তাই মার্কসের পূর্ববর্তী কল্পনাবাদী ও মার্কস-উত্তর সমাজবাদীদের যোগসূত্র বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না।

প্রুধোঁ

মার্কসের সমসাময়িক পিয়ারে জোসেফ প্রুধোঁকে (১৭৫৮-১৮২৩) ইউটোপিয়ান সমাজবাদীদের পর্যায়ে ধরলেও অনেকে তাঁকে নৈরাজ্যবাদী মনে করে থাকেন। কারণ তিনি সরকার ও শাসনযন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। "সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তির পরিণাম"—প্রুধোঁর এই বলিষ্ঠ ঘোষণা সমাজবাদের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। প্রুধোঁ ছিলেন মানুষের স্বাভাবিক সাম্যে বিশ্বাসী এবং তাঁর মতে প্রত্যেকে নিজ শ্রমের পরিপূর্ণ অধিকারী। তবে যৌথভাবে শ্রম

করে শ্রমলব্ধ ফলকে সমানভাবে বণ্টন করে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। প্রুধোঁর একটি নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন যে, অধিকতর কর্মকুশলতার জন্য সামাজিক সম্মান ও আত্মতৃপ্তি পেলেও সেই বাবদে অপেক্ষাকৃত অধিক পারিশ্রমিক দাবি করার কোন সংগত যুক্তি নেই। অর্থাৎ তাঁর সাম্য গাণিতিক সমতা নয়, এর আধার ন্যায়বিচার। সমাজ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল দূর করার জন্য এ এক অপরিহার্য শর্ত। প্রুধোঁ মনে করতেন যে, শ্রমিকদেরই কেবল সামাজিক সম্পদ উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। শ্রম ব্যতিরেকে ভূমি ও পুঁজি একেবারে বন্ধ্যা। প্রুধোঁ সম্পত্তি-প্রথাকে শাসন-ব্যবস্থার মূল রূপে বিবেচনা করতেন। প্রুধোঁ তাই সমাজবাদী রাষ্ট্রেও যৌথ সম্পত্তি রাখার বিরূপ সমালোচনা করে গেছেন।

প্রুধোঁর পর কল্পনাবাদী সমাজবাদের ধারা শুকিয়ে যায় নি। বহুদিন যাবৎ 'বৈজ্ঞানিক' সাম্যবাদের পাশাপাশি 'কাল্পনিক' সাম্যবাদের প্রবাহও বয়ে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Roads to Freedom — বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল
Democratic Socialism — অশোক মেহতা
Socialism : Utopian and Scientific — এঙ্গেলস
The Intelligent Woman's Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism and Fascism — জর্জ বার্নার্ড শ'

॥ ৫ ॥

মার্কস্‌বাদ

মার্কস্‌বাদের গুরুত্ব

এর পর মার্কস্‌বাদ। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, পৃথিবীর এক সুবিশাল অংশে মার্কস্‌বাদী রূপে পরিচয়-দানকারী রাজনৈতিক দল সমূহের শাসন চলছে এবং তার প্রভাব-বহির্ভূত দেশ সমুহের জনসাধারণের মনেও মুক্তির বার্তাবহনকারী রূপে ওই একক বিচারধারার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। ওই সব দেশের রাজনৈতিক দল সমূহের কার্যকলাপ ও শাসন-ব্যবস্থাকে অনেকে মার্কস্‌বাদের বিকৃতি রূপে আখ্যা দিলেও তাঁরা স্বয়ং নিজেদের মার্কসের অনুগামী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং তাই মার্কসের প্রভাব আজ অপর যে কোন সমাজ-বিপ্লব-শাস্ত্রীর চেয়ে অধিক—এই সত্যের প্রতি চোখ বুঁজে থাকা চলে না। এই জন্য মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে এখানে অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করা হবে। তবে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, কার্ল মার্কস্‌ (১৮১৮-১৮৮৩) রচিত সাহিত্য-সমুদ্র এতই বিশাল এবং তার উপর এত অসংখ্য টিকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হয়েছে যে, এই আলোচনার স্বল্প পরিসরের মধ্যে মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা দেওয়া কোন-মতেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা ছাড়া মার্কস্‌বাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা দিক্‌ থাকলেও আমাদের আলোচনার জন্য মূলতঃ তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে তার উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হবে।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ হচ্ছে মার্কস্‌বাদের ভিত্তি। মার্কস্‌ হেগেলের কাছ থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি (dialectical method) ধার করলেও এর প্রয়োগ এক সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে করেছিলেন। দ্বান্দ্বিক

প্রক্রিয়ার মতে উত্থান-পতনের এক চিরকালীন প্রবাহ চলেছে। কোন এক বিশেষ প্রবণতার (tendency) চূড়ান্ত সাফল্যের মধ্যে তার বিরোধী তত্ত্বের বীজ নিহিত থাকে। তাই চরম বিজয়-মুহূর্তেই তার অবসানের সূচনা হয়, আর এই নবীন প্রবণতার ভিতর পূর্বতন প্রবণতার বৈশিষ্ট্যাবলী ওতপ্রোত থাকে বলে এ অধিকতর সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে চিন্তা ও ঘটনার ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা সমূহের যে সংঘর্ষ হয়, তা অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ এর ফলে সত্য ও বাস্তবতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কোন অবসান নেই—এ শাশ্বত।

হেগেলের মতে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার প্রেরক শক্তি (driving force) হচ্ছে ভাব বা আইডিয়া। মার্কস্ এ কথা মানেন না। তিনি বলেন যে, কোন বিশিষ্ট মনের ভাব না হলে সে ভাব নিরর্থক। তা ছাড়া তাঁর জড়বাদ তাঁকে বলে যে, মন স্বয়ং কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়—এ হচ্ছে পরিবেশের (আবহাওয়ার পরিবর্তন, নূতন কাঁচামাল ও নবীন উৎপাদন-পদ্ধতির আবিষ্কার ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে) প্রতিচ্ছবি। মনোজগতে যে সব ঘটনা ঘটে, তা বহির্বিশ্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইতিহাসের ধারা

পূর্বোক্ত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘটনা সংঘটিত হবার জড়বাদী কারণ যোগ করলে মার্কসীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস ব্যাখ্যার ভিত্তি পাওয়া যায়। এতদনুযায়ী পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার সংঘর্ষের ফলে ঘটনা সংঘটিত হয়। তাই কোন ঘটনার সত্যকার রহস্য বা ইতিহাসের যথার্থ ভাষ্য জানতে হলে এই দ্বিবিধ পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা বা তাদের সংঘর্ষের পরিণাম জানতে হবে। চিন্তা-জগতের মত ঘটনা-জগতেও প্রতিটি আন্দোলনের সাফল্যের ভিতর তার বিরোধী তত্ত্বের বীজ থাকে। সামন্তবাদ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি

করল, যার থেকে বুর্জোয়া বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হল এবং তারা কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করে সামন্তবাদ ধ্বংস করল। গড়ে উঠল পুঁজিবাদ। আবার এই পুঁজিবাদের ফলে এক শ্রেণী-সচেতন সর্বহারা বাহিনীর সৃষ্টি হচ্ছে বলে পুঁজিবাদের ভিতরই তার নিজের মরণবাণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এইভাবে থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস এবং তাদের সিন্থেসিস বা সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে সমাজ-প্রবাহ এগিয়ে চলে।

অর্থনীতিই মূলাধার

মার্কসবাদের এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ-ভিত্তিক দর্শনের আলোকে এবার আমরা তাঁর রাজনৈতিক ধারণা সমূহের পর্যালোচনা করব। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'ফ্রিডম এণ্ড অর্গানিজেশান' নামক গ্রন্থে এঙ্গেলসের নিম্নোক্ত যে উদ্ধৃতি আছে, তা আমাদের মার্কসবাদের রাজনীতি বোঝার ব্যাপারে পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে। এঙ্গেলস বলছেন, "ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা এই প্রতিজ্ঞা (proposition) মেনে নিয়ে অগ্রসর হয় যে, মানবের জীবনধারণোপযোগী পণ্যরাজির উৎপাদন এবং তারপর পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ই যাবতীয় সামাজিক কাঠামোর আধার। ইতিহাসে অদ্যাবধি যে সব সমাজের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়েছে, তাদের ধনবণ্টন-প্রণালী ও শ্রেণী-বিভাজন-পদ্ধতি উৎপন্ন পণ্যের প্রকারভেদ এবং উৎপাদন ও বণ্টন প্রণালীর উপর নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যাবতীয় সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের চূড়ান্ত কারণ খুঁজতে হলে মানুষের মস্তিষ্ক বা শাশ্বত সত্য ও ন্যায়বিচার উপলব্ধির ব্যাপারে তার সুপরিণত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে পরিবর্তিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বিনিময়-পদ্ধতির ভিতর। এ রহস্যের চাবিকাঠি সে যুগের "দর্শনশাস্ত্রের" ভিতর নেই, আছে সমসাময়িক "অর্থনীতির" ভিতর। প্রচলিত সামাজিক কাঠামো অযৌক্তিক ও অন্যায়, এবং যুক্তি এবার যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ও

ন্যায়-অন্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে—এই অনুভূতি ক্রমশঃ প্রবল হবার অর্থই হচ্ছে এই যে, উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে অলক্ষিতে পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ফলে পূর্বতন আর্থিক অবস্থার আধারে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা আর কালোপযোগী নেই। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, এখন যে সব অসামঞ্জস্য চোখে পড়ছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ও অল্পাধিক বিকশিত অবস্থায় এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে।"

পূর্বোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। (১) খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয় ইত্যাদির প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পৃথিবীর বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ বা উৎপাদনের কাঁচা মাল নিয়ে কাজ করতে শিখেছে। এইভাবে মানুষ ও দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। (২) আর এই উৎপাদন-ক্রিয়ার জন্য মানুষে মানুষেও একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিণামে মানবসমাজে শ্রম-বিভাজন ও বিশেষজ্ঞ প্রথা দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন দ্রব্যের উপর বিশেষ কারও অধিকার এবং অপর সকলের অনধিকারের তত্ত্বও স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের উপর কারও স্বামিত্ব মেনে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয়েছে যে অপর সকলের ওই বিশেষ দ্রব্যটির উপর অধিকার নেই। তবে এই সব "অপরেরা" ওই দ্রব্যের মালিক না হলেও মালিকদের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে ওই সব দ্রব্য নিয়ে কাজ করতে তাদের বাধা নেই। বিভিন্ন প্রকারের মালিকানার অধীনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সব দ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা যেতে পারে এবং এরই পরিণামে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধে পার্থক্য হয়। অতএব শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের বিকাশক্রমের কোন বিশেষ সময়ে মানুষে মানুষে সম্পর্কের নির্ণায়ক হচ্ছে সেই সময়কার দ্রব্য সমূহের মালিকানা ও তাদের দ্বারা কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি।

পুঁজিবাদের স্বরূপ

এর পর মার্কস্‌ বললেন যে, লিখিত ইতিহাসের নজির থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক যুগে যুগে বাহ্যতঃ পৃথক্‌ মনে হলেও মূলতঃ তা অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ এ সম্বন্ধ শোষণের এবং এরই জন্য সমাজ দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে মার্কস্‌ সমাজের তিনটি মূল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—দাসত্ব-প্রথা-ভিত্তিক সমাজ, সামন্তবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ। প্রথম দুটি অবস্থায় শোষণ-প্রক্রিয়া তো একেবারে প্রত্যক্ষ। দাস এবং প্রভু, অথবা ভূমিদাস এবং ভূম্যধিকারী—যে গোষ্ঠীর সঙ্গেই সম্বন্ধের উদাহরণ নেওয়া যাক না কেন, দেখা যাবে যে এ সম্বন্ধের নির্ণায়ক শক্তি হচ্ছে কাঁচা মালের মালিকদের সঙ্গে সেই কাঁচা মাল নিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের সম্বন্ধ। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নিছক বেঁচে থাকার উপকরণ কেনার মত স্বল্প বেতন অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যের শ্রমমূল্য মাত্র পায়, এবং আসল মূল্য থেকে শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত শ্রমমূল্য বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই হচ্ছে উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকবর্গ কর্তৃক গৃহীত অতিরিক্ত মূল্য (surplus value)। কালক্রমে এই অতিরিক্ত মূল্যকেই আবার পুঁজি রূপে উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করে নব নব অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করা হয় ও এ পদ্ধতি অখণ্ড গতিতে চলতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও ওই একই ব্যাপার চলে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কয়েকটি প্রক্রিয়া। এখন উৎপাদন প্রত্যক্ষ উপভোগের জন্য না হয়ে বিক্রয়ের জন্য হয়ে থাকে, উৎপাদক ও উপভোগের মধ্যে এক মধ্যবর্তীর (middleman) আবির্ভাব হয় এবং ক্ষেত্র-বিশেষে শোষিত ও আর্থিক দিক্‌ থেকে পরাধীন এই সব শ্রমিকদের ভোট রূপী রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়। তবে মার্কসের মতে এর ফলে শোষণের চারিত্রধর্মে কোন ইতর-বিশেষ ঘটে না।

সর্বহারাদের বিপ্লব

এইভাবে শ্রমিক-শোষণের ফলে পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর বিকাশ হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শোষিত সর্বহারার সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলে। তা ছাড়া, পুঁজিবাদের ভিতর এক কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা আছে, যার ফলে ছোট ছোট পুঁজিপতিরা বৃহৎ শিল্পপতিদের উদরে লীন হয়ে যায়। এর উপর রয়েছে যন্ত্রযুগের অমিত যান্ত্রিক প্রগতি, যার ফলে এক দিকে বিশালায়তন পুঁজিবাদ খাড়া হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সমাজের ভিতর বেকারত্ব ও তজ্জনিত অনশন এবং হাহাকার দেখা দেয়। এইভাবে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের কারণে একদিকে অগণিত শোষিত সর্বহারা শ্রেণী এবং অপর দিকে মুষ্টিমেয় শোষক পুঁজিপতি সম্প্রদায় থেকে যায় এবং তখন এই সব সর্বহারা ("হাতে-পায়ের শিকল ছাড়া যাদের হারাবার মত আর কিছু নেই") সংগঠিত হয়ে তাদের দল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল ক'রে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং যাবতীয় উৎপাদন-যন্ত্রও এই সর্বহারাদের রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। কারণ উৎপাদন-যন্ত্রের কোনরকম ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে আবার এক দল লোক অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করতে থাকবে ও শ্রমিকদের শোষণও তার ফলে অব্যাহত গতিতে চলবে।

মার্কস্ কখনও এ কথা গোপন করেন নি যে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে সর্বহারাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার এই বিপ্লব রক্তাক্ত ও সহিংস হবে। নিয়ত বিকাশের পরিণাম স্বরূপ আর্থিক বিবর্তন ধাপে ধাপে হলেও এতদুপযোগী রাজনৈতিক পরিবর্তনের পৃষ্ঠ-ভূমি তৈরী হতে কিছুটা সময় লাগে বলে এ পরিবর্তন আকস্মিক এবং তাই হিংসাত্মক হতে বাধ্য। এ ছাড়া বিশেষ এক উৎপাদন-ব্যবস্থার আওতায় যে রাজনৈতিক, সাংবৈধানিক ও নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেলেও তা নিজস্ব প্রাণশক্তির কারণে সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না। আর এর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থার

আওতায় এক শাসক শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং তাদের কায়েমী স্বার্থ যাবতীয় পরিবর্তনের পরিপন্থী হয়ে থাকে। বিনা সংগ্রামে এরা কর্তৃত্ব ছাড়ে না এবং শুধু তাই নয়, শিক্ষা ও প্রচার-ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর কর্তৃত্ব থাকার জন্য এরা নব-বিধানের বিরুদ্ধে গণমানসকে বিষাক্ত করার প্রচেষ্টা করে। তাই নির্মমভাবে কায়েমী স্বার্থের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অভূতপূর্ব ঘটনা

সর্বহারাদের এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে অতীত ইতিহাসের কোন-কিছুর তুলনা চলে না। কারণ ইতঃপূর্বে অনেকানেক শ্রেণী তদানীন্তন সমাজের স্ববিরোধের জন্য অপর শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হলেও সে সব অভ্যুত্থান প্রত্যুত সমাজের এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পরাভূত করার নিদর্শন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় মানবসমাজের বৃহত্তম অংশের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে। তাই যদিচ সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব গোড়ায় শ্রেণী-আধারিত সমাজ-ব্যবস্থা রূপে দেখা দেয়, এর অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে সর্ববিধ শ্রেণীর বিলোপ। সুতরাং সর্বহারাদের সংগ্রাম সমগ্র মানব জাতির মুক্তির বাণীবাহক। অবশ্য অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বহু সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। মার্কসের মতে এর জন্য মোটামুটি দুটি ধাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। (১) প্রথমাবস্থায় রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হবে ; (২) সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat) কর্তৃক সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিনাশ সাধিত এবং অপরাপর শ্রেণী অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে কমিউনিস্টদের আদর্শ স্থিতি শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হবে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আর থাকবে না। কারণ সমাজে একটি মাত্র শ্রেণী অবশিষ্ট থাকলে তখন কোন্ শ্রেণী আর কার উপর শাসন চালাবে? আর রাষ্ট্র তো প্রকৃত প্রস্তাবে এক শ্রেণী দ্বারা অপর শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব করার সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিংসা অনিবার্য

এইবার পূর্বোক্ত দুই অবস্থার কথা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক। কমিউনিস্টরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া সমাজে কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করা যায় না। অতীত অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শ্রমিক সমাজের পক্ষে প্রচলিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তা দিয়ে নিজেদের অভীষ্ট পূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। তাঁদের মতে প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিবর্তন করলেই তার দ্বারা কোন বৈপ্লবিক কাজ হবে মনে করা ভুল। সুতরাং পুঁজিপতিরা উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক থাকা পর্যন্ত শ্রমিকদের তরফ থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণের কোন মানে হয় না। আর্থিক জীবন পুঁজিপতিদের হাতে থাকার দরুন তারা পার্লামেন্টের দ্বারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে এবং এমনকি আর্থিক দৃষ্টি থেকে শৃঙ্খলিত শ্রমিক সমাজের ভোটাধিকারও এক প্রহসনে পর্যবসিত হবে। অতএব নিয়ম-তান্ত্রিকতাকে বর্জন করে প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে উৎখাত পূর্বক সর্বহারাদের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

স্বভাবতঃই পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন তাই প্রচণ্ডভাবে রক্তাক্ত হবে। কেবল পুঁজিপতিদের সরানোর জন্যই যে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রয়োজন হবে, তা নয়। প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার জন্যও এর প্রয়োজন ঘটবে। এঙ্গেলসের মতে, "কাজে কাজেই বিপ্লবে বিজয়ী পার্টিকে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই অস্ত্র—ত্রাসের সাহায্যে রাজ্য চালাতে হবে। প্যারিস কমিউনে যদি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্য জনগণ অস্ত্রবলের ভিত্তিতে সংগঠিত না হত, তা হলে তার অস্তিত্ব কি চব্বিশ ঘণ্টার বেশী টিকে থাকত?" বুর্জোয়াদের অনেক সুবিধা আছে। তারা শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সামরিক শক্তিতে অগ্রসর। তাদের ধনবল, জনবল এবং রসদের কোন অভাব নেই। তাই একবার এক আকস্মিক বিপ্লবের দ্বারা তাদের

হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলেই যে তারা সন্তুষ্ট চিত্তে সে অবস্থা মেনে নেবে, এ কথা মনে করা ভুল। লেনিন তাই বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি সত্যকার বিপ্লবের লক্ষণ হচ্ছে এই যে, শোষণকারীরা দীর্ঘকাল জেদীর মত মরিয়া হয়ে নূতন ব্যবস্থার প্রতিরোধ করে। নিয়ম হচ্ছে এই, আরও বহু বৎসর তারা শোষিতদের তুলনায় নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকবে। এই নব সুযোগ-সুবিধা সহ মরিয়া হয়ে এক চূড়ান্ত সংগ্রাম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু লড়াই না লড়ে শোষণকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতদের সিদ্ধান্তের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।" তাই "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদের আওতায় উপনীত হবার পর্ব ইতিহাসের এক পূর্ণাঙ্গ যুগসন্ধি (a whole historical epoch)।"

তারপরও দমননীতি

অতএব বিপ্লবকালে বর্তমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিকদের এক "quassi-state" বা আধা-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করে ব'লে একে শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান বলা চলে এবং অন্তর্বর্তী কালে স্বভাবতঃই এ রাষ্ট্র হবে "নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন প্রতিষ্ঠান নয়, এ হবে যুদ্ধের প্রতিষ্ঠান।" এ রাষ্ট্র একচ্ছত্র প্রতাপের অধিকারী হবে এবং অপর কোন দলকে এ রাষ্ট্রে মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল থাকবে এবং তা হল সর্বহারাদের দল কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টি ও তার অধীন রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া দলনে নিয়োগ করা হবে। এঙ্গেলসের মতে, "রাষ্ট্র এক অস্থায়ী বা সাময়িক প্রতিষ্ঠান (institution) এবং বিপ্লবের সময় বলপ্রয়োগের দ্বারা বিরোধীদের দমন করার জন্য এর শরণ নিতে হবে বলে স্বাধীন ও জনপ্রিয় রাষ্ট্রের কথা বলা নিছক এক অবাস্তব কল্পনা। যতক্ষণ সর্বহারাদের কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে, ততক্ষণ রাষ্ট্র দ্বারা স্বাধীনতা সংরক্ষণ নয়, সর্বহারাদের বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দের দমন করার জন্যই রাষ্ট্রকে কাজে লাগাতে হবে। আর স্বাধীনতা ইত্যাদির

কথা বলার মত সময় যখন আসে, তখন রাষ্ট্র বলে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।"

মার্কস্‌বাদ ও গণতন্ত্র

এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ড আমেরিকায় যে অর্থে গণতন্ত্র শব্দটি প্রযুক্ত হয়, কমিউনিস্ট অভিধানে কিন্তু তার কোন স্থান নেই। তাঁদের মতে পুঁজিবাদের আওতায় গণতন্ত্র বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না; কারণ আর্থিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের নাম নেওয়া প্রত্যুত কায়া ছেড়ে ছায়ার অনুসরণ করার নামান্তর মাত্র। সবচেয়ে চড়া দামে যে শ্রম কিনতে পারে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া শ্রমিকদের কোন গতি নেই ব'লে ব্যক্তি-স্বাধীনতা তার কাছে নিরর্থক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা, সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র এবং মঠ-মন্দির ইত্যাদির আসল নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তরালে আত্ম-গোপনকারী উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক পুঁজিপতিবর্গ। আর যে বুভুক্ষু শ্রমিককে উদরান্নের সংস্থানের জন্য অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, তার কাছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমালোচনা করার অধিকার এক বুর্জোয়া-সুলভ বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্ত জিহ্বার চেয়ে তার কাছে ভর্তি পেটের প্রয়োজন বেশী। পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর সে যে একবার ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে, তারই বা কতটুকু মূল্য? কোন্ নেকড়েটিকে মেষশিশু নিজের হননকারী রূপে নির্বাচন করবে? অতএব কমিউনিস্ট বিশ্বাস অনুযায়ী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নেই এবং শ্রমিকদের বিপ্লবী রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক দল সমূহের অবাধ স্বাধীনতা রূপ বুর্জোয়া বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য যতদিন না বিপ্লব সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন মুষ্টিমেয় বিপ্লব-নায়কের জঙ্গী মনোভাব এবং জঙ্গী ইচ্ছা ও কর্মশক্তি দ্বারাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

শেষ পর্যায়

বিপ্লবের সময় বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে সঞ্চালিত করা হলেও, যখন শেষ অবধি বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা হয়ে যাবে এবং আর যখন প্রতি-বিপ্লবের আশঙ্কা থাকবে না, তখন শ্রেণী-স্বার্থের প্রতীক রাষ্ট্র—যা এ যাবৎ "দমনের যন্ত্র স্বরূপ" ছিল, তার অস্তিত্বও আর রইবে না। অতএব বুর্জোয়া ও প্রতি-বিপ্লবীদের কঠোরভাবে দমন করার ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের আত্ম-অবলুপ্তি (withering away) ঘটবে। কারণ তখন এমন কারও অস্তিত্ব নেই, যাকে দমন করা প্রয়োজন। এর পরিবর্তে তখন সার্বজনীন কাজ (public business) চালাবার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতা ও সমবায়ের ভিত্তিতে এক স্বাধীন সমাজ গড়ে উঠবে। এই সমাজের আবির্ভাব এই সত্যের দ্যোতক যে, এবার বিপ্লবের যুগের অবসান ঘটেছে। মার্কস্‌বাদীরা এইখানেই তাঁদের বক্তব্যের ইতি করেন। আদর্শ সমাজের বিস্তারিত বর্ণন বা একে সাকার করার পদ্ধতির বিশদ পর্যালোচনা কোন কমিউনিস্ট সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

লেনিন

পৃথিবীতে প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার হিসাবে মার্কস্‌-এঙ্গেলসের অনুগামী লেনিন (১৮৭০--১৯২৪) পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেনিনের মত রোজা লুক্‌জেমবুর্গও সমাজবাদের এক অসাধারণ প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু এক সফল কার্যক্রমের নায়ক হিসাবে লেনিনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রোজা লুক্‌জেমবুর্গের চেয়ে অনেক বেশী। লুক্‌জেমবুর্গের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে মার্কস্‌-এঙ্গেলসের পরবর্তী মার্কস্‌বাদী হিসাবে লেনিনের বিচারধারা ও কর্মনীতির উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে লেনিনকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর সমসাময়িক রোজা লুক্‌জেমবুর্গের সঙ্গেও পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

লেনিনের মতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন খুব বেশী হলে ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত যেতে পারে; এর ভিতর দিয়ে কোন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে না বলে এর দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল সচেতন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী দল কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের সর্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত কর্মীরাই গণনেতৃত্বে পারঙ্গম। তাঁর চিন্তাধারার মূল কথা হচ্ছে, মুষ্টিমেয়-সংখ্যক সচেতন বিপ্লবীরাই সমাজবাদী আন্দোলন পরিচালনা করবে। লেনিন স্তরে স্তরে সেইসব বিপ্লবীদের অবস্থিতি নির্দেশ করে গেছেন। প্রত্যেকটি স্তর, প্রতিটি ব্যক্তির সেখানে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এবং তারা সরাসরি উপরের স্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পাশাপাশি স্তরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। এইভাবে লেনিন শ্রমিক পার্টিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বদলে বরং সামরিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি পেশাদার বিপ্লবী, সচেতন ও একনিষ্ঠ কর্মীর ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। পক্ষান্তরে, রোজা লুক্‌জেমবুর্গ সমগ্র শ্রমিক সমাজকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। লেনিন বাছাই-করা সুশিক্ষিত পেশাদার বিপ্লবীদের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীকে চালনা করার কথা বলেছিলেন; আর লুক্‌জেমবুর্গ সমগ্র শ্রমিক সমাজকে সচেতন করে তাদের দ্বারা বিপ্লব আবাহন করতে চেয়েছিলেন। কারণ লুকজেমবুর্গের মতে নেতা ও জনতার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়া সমাজবাদের অন্যতম লক্ষ্য। লেনিনবাদের মতে মুষ্টিমেয়-সংখ্যক সচেতন বিপ্লবী (তারা শ্রমিক সমাজেরই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই) সমাজবাদী বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ। তারাই সমাজবাদী বিপ্লবের উপরের তলার বাসিন্দা এবং ইতিহাসের অবিসম্বাদী স্রষ্টা। তাদের পার্টির নাম হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। এরাই হচ্ছে শ্রমিকদের যথার্থ প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের চেয়েও শ্রমিক স্বার্থের অধিকতর দক্ষ সংরক্ষক। লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিকে রুসোর (অন্য প্রসঙ্গে উক্ত) "সাধারণ ইচ্ছার"

প্রতীক মনে করতেন। তাঁর মতে শ্রমিকদের "ব্যক্তিগত ইচ্ছা" অনেক সময় শ্রমিকদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে বলে কমিউনিস্টদের "সাধারণ ইচ্ছার" মূর্তকরণের খাতিরে নির্মম হতে হয়।

লেনিনের পর

এই অর্থে বুখারিন, ট্রট্স্কি ও স্টালিন—সকলেই লেনিনের উত্তর-সাধক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিরোধ বাধে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পুনর্গঠন-পদ্ধতি নিয়ে। তদানীন্তন রাশিয়া আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর ছিল। সমাজবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করে তার উন্নয়ন করতে গেলেও প্রশ্ন দাঁড়ায়, এর উপযুক্ত পুঁজি আসবে কোথা থেকে। তাই লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট ভূমিতেই সমাজবাদী পুনর্গঠনের তিনটি বিকল্প ধারা দেখা দিল। বুখারিন বলেছিলেন যে, কৃষকদের অবাধ উৎপাদনের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং যৌথ ক্রয়, ঋণের সুবন্দোবস্ত ও কৃষি উৎপাদনের সমৃদ্ধিকে ভিত্তি করে সমগ্র জাতীয় উৎপাদন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। শিল্প-ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব ছিল, মূল শিল্পগুলি ছাড়া বাকী ছোট ছোট শিল্প-কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ছেড়ে দেওয়া হোক। কারণ শাসন-ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্য শ্রমিকদের হাতে থাকায় পুঁজিবাদের পুনরভ্যুত্থানের আশঙ্কা নেই এবং সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতির ফলে পুঁজির সমস্যা ধীরে ধীরে মিটে যাবে। ট্রট্স্কি এর বিরোধিতা করে বললেন যে, অবিলম্বে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন দ্বারাই কেবল রাশিয়া সমাজবাদের দিকে এগোতে পারে। পুঁজির সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করা ও "চিরন্তন বিপ্লবের" নীতি ঘোষণা করলেন। চিরন্তন বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে অনগ্রসর দেশে সমাজবাদী পুনর্গঠন সফল করার জন্য শ্রমশিল্পে অনগ্রসর দেশ সমূহেও বিপ্লব সংসাধনের প্রয়াস করা। অর্থাৎ রাশিয়ার পুনর্গঠনের জন্য শিল্পসমৃদ্ধ জার্মানী বা ইংলণ্ডেও শ্রমিক-বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করা। এর ফলে এক দিকে সেই সব দেশের উন্নত শিল্প ও কারিগরী জ্ঞান অনুন্নত দেশের কাজে লাগবে এবং অন্য

দিকে দেশরক্ষা বাবদ নিজেদের যে ব্যয় হয়, তা অনগ্রসর সমাজবাদী দেশে পুঁজি রূপে বিনিয়োগ করতে পারা যাবে। অর্থাৎ তাঁর মতে একটিমাত্র দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; এর জন্য বিশ্ব-বিপ্লব চাই। স্টালিন এক তৃতীয় পথের কথা বললেন। তাঁর মতে এক দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই অভিমত ঘোষণা করে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, ব্যাপক আন্দোলনের ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে যৌথ খামারের আধারে গঠন করতে হবে এবং দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান অন্ততঃ দশ-বিশ বৎসর নিতান্ত "অবনত" না করলেও "স্থির" রেখে কঠিনতর পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোগ্য উপকরণ বাবদ ব্যয় সংকোচের দ্বারা পুঁজি সৃষ্টি করতে হবে।

যাই হোক, নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্র ও রক্তপাত দ্বারা ট্রট্স্কি নির্বাসিত ও পরে নিহত হলেন এবং বুখারিনকেও অনুরূপভাবে ইহলোক ত্যাগ করতে হল বলে তাঁদের পদ্ধতির বাস্তব রূপায়ণের সুযোগ ঘটে নি। তবে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল স্টালিন একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালিয়েও মার্কসীয় লক্ষ্যের অর্থাৎ "a society of free and equals"-এর ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেন নি—এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য স্টালিনের আওতায় সোভিয়েট অর্থনীতির যে বিপুল উন্নতি হয়েছে, তার কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। যদিচ অনেকে মনে করেন যে, এর জন্য যে উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে তার সার্থকতা খুব বেশী নেই। কারণ এর চেয়েও অনেক কম প্রযত্নে একাধিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার তুলনায় অধিকতর আর্থিক সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে।

যাই হোক, আমাদের এ আলোচনা আর্থিক সমৃদ্ধির মূল্যায়নের জন্য নয়, শাসন ও শোষণ বিহীন সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করার দিক থেকে কোন্ মনস্বী কর্মীর পথ মানবসমাজকে কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছে তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সে দিক থেকে দেখতে গেলে মার্কস্‌বাদের ফলিত (applied) রূপ—লেনিন, স্টালিনের কর্মসূচী বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। ১৯৩৭ সনে শেষবারের মত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে

রাষ্ট্রের আত্ম-অবলুপ্তির আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। তার পর রুশ সমাজবাদীদের মুখে এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু শোনা যায় নি।

ব্যক্তি-পূজার সমর্থক হবার জন্য স্টালিন লেনিনবাদ তথা মার্কস্‌বাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন বলে ক্রুশ্চেভ তাঁর সমালোচনা করলেও স্বয়ং তিনি যে মোটামুটি স্টালিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে ক্রুশ্চেভ প্রবর্তিত মুক্তির হাওয়া অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলেও আজও রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থার মূল চারিত্র-ধর্ম—ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংকোচন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সমাজবাদকে সাকার করার জন্য লেনিন যে মার্কস্‌বাদী ধারা (মতান্তরে মার্কস্‌বাদের বিকৃতি) প্রবর্তন করেন, স্টালিন ও ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি তারই যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে মাও-সে-তুং-এর "Let a hundred flowers blossom : let a hundred schools contend" উক্তি অনেকের মনেই চীনের কমিউনিজম সম্বন্ধে একটা নূতন আশার সৃষ্টি করলেও অনতিবিলম্বেই সে আশা মরীচিকার মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভারতের প্রতি কমিউনিস্ট চীনের আগ্রাসী কার্যকলাপের কথা যদি সাময়িকভাবে ছেড়েও দেওয়া যায় তবু ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ থেকে আরম্ভ করে কেনিয়া অবধি এসিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রচেষ্টা ও সেই সব দেশে কমিউনিজম রপ্তানী করার প্রয়াসের মাধ্যমে চৈনিক কমিউনিজমের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা তার সনাতন রূপের থেকে পৃথক্ নয়। এছাড়া তথাকথিত "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" নামে গত দুই-আড়াই বৎসর খাস চীনের মূলভূমিতেই যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল তার দ্বারাও চৈনিক কমিউনিজমের স্বৈরতন্ত্রী স্বরূপ বোঝা যায়।

পূর্ব-ইউরোপের পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়াতে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ স্বাধীনতার হাওয়া বওয়া শুরু করলেও সেইসব দেশে এখনও কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য লেভিয়াথান (leviathan)

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। রাষ্ট্রের চারিত্র-ধর্মের বিচারে আলবেনিয়া তো বটেই, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েৎনামকেও ওই একই পর্যায়ভুক্ত করলে বিশেষ অন্যায় হবে না। রুশ-চীনের প্রভাব-বলয়-বহির্ভূত টিটোর যুগোশ্লাভিয়াতে সম্প্রতি ওয়ার্কার্স্‌ কাউন্সিল ও দলবিহীন গণতন্ত্রের যে পরীক্ষা চলছে, তার প্রতি অনেকে আশাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যুগোশ্লাভিয়ার এই নূতন পদক্ষেপ সম্বন্ধে এর পর আলোচনা করা হবে। কিন্তু সেখানে যত অগ্রগতিই হোক না কেন, যুগোশ্লাভিয়ার সরকার যতদিন জিলাস প্রমুখ নিষ্ঠাবান অথচ প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনাকারী কমিউনিস্টের কণ্ঠরোধ করে রাখবেন ততদিন সে দেশ সমৃদ্ধ ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে বলে স্বীকার করা চলবে না। মার্কস্‌বাদের অন্যতম ফলিত রূপ স্টালিনবাদের সঙ্গে এদের মাত্রার তফাৎ; খুব একটা মৌলিক গুণগত পার্থক্য চোখে পড়ে না।

গ্রন্থপঞ্জী

Communist Manifesto	মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস
State and Revolution	লেনিন
What Marx Really Meant	জি. ডি. এইচ. কোল
Guide to the Philosophy of Morals and Politics	সি. ই. এম. জোড
The Coming Struggle for Power	জন স্ট্রেচী
Contemporary Capitalism	„ „
Leninism	জোসেফ স্ট্যালিন
A Handbook of Marxism	এমিল বার্নস
The Life and Teaching of Karl Marx	ম্যাক্স বীয়র
মার্কসবাদ	ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ
Intelligent Women's Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism and Fascism	জর্জ বার্নার্ড শ'
The Managerial Revolution	জেমস বার্নহাম
The New Class	মিলোভান জিলাস

সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি বিপ্লব (পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৪)
গোপাল হালদার

॥ ৬ ॥

নৈরাজ্যবাদ, সোশাল ডেমোক্রেসী ইত্যাদি

নৈরাজ্যবাদ

রুশ দেশের অভিজাত বংশোদ্ভূত মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) আধুনিক নৈরাজ্যবাদের জনক হলেও খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর চৈনিক দার্শনিক চ্যাং তু-র (Chuang Tzu) রচনাতেও নৈরাজ্যবাদী মনোভাবের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বাকুনিনের জীবন উত্তেজনা ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চলার জন্য তিনি তদানীন্তন ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে সেই সব রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের হাতে দীর্ঘ কারাবাস ও অন্যবিধ কঠিন নির্যাতন ভোগ করতে হয়। প্রুধোঁ এবং জর্জ স্যাণ্ড তাঁর বিচারধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। মার্কস্ এবং এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কখনও সদ্ভাব ছিল না। বরং সোশালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে তাঁদের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্র-বিরোধী। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হলেই নৈরাজ্যবাদীরা তা স্বীকার করে নেবেন না। তাঁরা যদি আদৌ কোন শাসন-ব্যবস্থা মেনে নেন, তবে তার ভিত্তি হবে সকলের সম্মতি। পুলিশ এবং আইন ইত্যাদি যে সব প্রথার দ্বারা সমাজের একাংশের ইচ্ছা অপর সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, নৈরাজ্যবাদীরা তার ঘোর বিরোধী। সংখ্যালঘুদের যতক্ষণ দণ্ডশক্তি বা ওই-জাতীয় অন্য কিছুর চাপে সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, ততক্ষণ নৈরাজ্যবাদীরা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয়ঃ মনে করেন না। তাঁদের কাছে স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। ব্যক্তির উপর থেকে সমাজের যাবতীয় জবরদস্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করে নৈরাজ্যবাদীরা তাঁদের এই লক্ষ্যে উপনীত হতে

চান। গোঁড়া সমাজবাদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী রাষ্ট্র একমাত্র পুঁজিপতি হলেই ব্যক্তি-মানব স্বাধীন ও মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে নৈরাজ্যবাদীরা আশঙ্কা করেন যে, এর ফলে রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের অত্যাচারী স্বভাব-ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে। তাঁরা তাই সামাজিক মালিকানার এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন, যার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যথাসম্ভব সংকুচিত হতে হতে অবশেষে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে।

রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯১২)-ও এই পথের পথিক। তবে বাকুনিনের তুলনায় তিনি অধিকতর সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক শৈলীতে নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ জনসমাজে উপস্থাপিত করেছিলেন। ক্রপটকিনের মতে, সংঘর্ষ নয়, পারস্পরিক সহযোগিতাই মানবসমাজ বিধৃত করে রাখার প্রেরক-শক্তি। আদর্শবাদী সমাজ-বাদীদের মত তিনি কেবল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করণীয় কাজের বদলে মানুষের কাজ করার ইচ্ছা বিবেচনা করে তার মজুরী নির্ধারণ করার আদর্শে পৌঁছেই নিরস্ত হন নি। তাঁর মতে কাজ করার কোন বাধ্যবাধকতাই থাকা উচিত নয় এবং সমগ্র জনসাধারণের সকলেই যাবতীয় সম্পদের সমানাংশের ভাগীদার হবে। তিনি কর্মকে মনোরম করার সম্ভাবনায় আস্থা রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তৎপরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থায় লোকে নিষ্কর্মা থাকার চেয়ে বরং কাজ করাকে অধিকতর কাম্য মনে করবে। কারণ সে অবস্থায় কাউকে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম বা কর্মের দাসত্ব করতে হবে না। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পসঞ্জাত অত্যধিক স্পেশালাইজেশনের স্থানও এ সমাজে থাকবে না। কাজ তখন হবে মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত গঠনধর্মী প্রবণতা সমূহের বাহ্য অভিব্যক্তির নিদর্শন। দিবসের কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র মানুষ এই চিত্তাকর্ষক কৃতির পিছনে নিয়োগ করবে। নৈরাজ্যবাদীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধন হিসাবে হিংসার শরণ নিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তবে "অপ্রতিরোধ" নীতির প্রবক্তা টলস্টয় ছিলেন এর ব্যতিক্রম।

সোশাল ডেমোক্রেসী

মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এবার মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় সমসাময়িক জার্মানীর ফার্ডিনাণ্ড লাসালের (১৮২৫-১৮৬৪) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লাসালের নামের সঙ্গে জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হচ্ছে, "মানব সভ্যতার মহান্ অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য এবং এর জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও অবস্থিতি।" শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক স্বতন্ত্র দল গঠন করে রাষ্ট্রশক্তির সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দেন ও তাদের জন্য এক মনোজ্ঞ কর্মসূচীও তিনি ছকে দিয়েছিলেন। লাসালের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রমিক সংগঠন উইলহেলম লাইবনেক্ট (১৮২৬-১৮৬৪) ও আগস্ট বেবলের (১৮৪০-১৯১৩) হাতে চলে যায় এবং তাঁদের নেতৃত্বে জার্মান শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশঃ মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ফন্ ভলমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভলমারই প্রথম এই সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মসূচীতে চাষীদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। সে যুগে সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয়করণ প্রায় সম-অর্থদ্যোতক ছিল। তিনি তাই ঘোষণা করেন, "এ রকম ধারণা ভ্রান্ত—কৃষকদের সম্বন্ধে সমাজবাদী নীতি কী হবে? তারা জমি চায়।" এ দিক থেকে তাঁকে তাই লেনিন ও মাও-সে-তুংয়ের পূর্বসূরী বলতে হবে।

বার্নস্টাইন ও কাউটস্কি

বার্নস্টাইন (১৮৫০-১৯৩২) প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কস থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রানুরাগী ও শান্তিপূর্ণভাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলতঃ নীতিধর্মী। তাঁর কাছে দৈনন্দিন সংস্কার ও পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়াই বড় কথা। হঠাৎ-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে তিনি এক

অহেতুক আজগুবি ব্যাপার মনে করতেন। বার্নস্টাইন মার্কসীয় অর্থনীতিরও অনেক সংশোধন করেন। বার্নস্টাইনের এই সব সংশোধনের ফলে সমাজবাদ তার অনেকখানি মার্কসীয় জঙ্গী মনোবৃত্তি বিযুক্ত হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে লক্ষ্য সিদ্ধির সাধন হয়ে উঠল। কিন্তু কার্ল কাউটস্কি (১৮৫৮-১৯৩৪) ছিলেন গোঁড়া মার্কসবাদী। মার্কস ঘটনা-প্রবাহের গতি সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করে "সামান্য ভুল" করেছেন বলে স্বীকার করলেও তাঁর ঘটনা-প্রবাহ নিরূপণকে কাউটস্কি অভ্রান্ত মনে করতেন।

ফেবিয়ান সমাজবাদ

পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের জন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা এক সংকট থেকে অপর সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে অবশেষে সর্বহারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ করে দেবে—মার্কসের এই সংকটবাদী তত্ত্ব-ভিত্তিক বৈপ্লবিক মতবাদে ফেবিয়ানদের আস্থা ছিল না। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের পর থেকে বিশেষতঃ ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি দেখা দেওয়ায় মার্কসবাদ কথিত সংকটের চিহ্ন কোন সুদূর দিগন্তেও দেখা যাচ্ছিল না। এরই প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে ইংলণ্ডের সমাজবাদ ফেবিয়ানধর্মী হয়ে ওঠে। (রোমক সেনাপতি ফেবিয়াস তাঁর ধীর অথচ সুনিশ্চিত রণকৌশলের জন্য খ্যাত ছিলেন বলে এই নূতন বিচারধারার প্রবর্তকরা তাঁর নাম গ্রহণ করেন।) ফেবিয়ানদের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজ-সংস্কারে ইচ্ছুক, সেখানকার শ্রমিক শ্রেণী আর্থিক সংগতি ও রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী। যে জাতির সামাজিক চৈতন্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, সেখানে সমাজতন্ত্রের শ্রেণী-সংগ্রাম বা বৈপ্লবিক কলা-কৌশল নিয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজন নেই। কোঁৎ, ডারুইন এবং স্পেনসারের মতবাদ ফেবিয়ানদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা ছিলেন বিবর্তনে বিশ্বাসী। তাঁদের বিশ্বাস, সামাজিক অগ্রগতি

অনিবার্যরূপে এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে "উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের জীবনযাত্রার উপরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।" তাঁদের মতে সে পরিবর্তন আপন প্রেরণায় এগিয়ে চলেছে; "আমরা সে প্রেরণাকে আত্মসচেতন করে তুলতে পারি মাত্র।" এবং ফেবিয়ানরা ঠিক সেই কাজই করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের মনোভাব বিরূপ ছিল না; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকেই তাঁরা একমাত্র মোক্ষ জ্ঞান করেননি। বার্নার্ড শ'র মতে, "কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের মত প্রতি মহল্লায় জনপ্রিয় স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।" ফেবিয়ানরা ইংলণ্ডের টোরী, লিবারাল ইত্যাদি রাজনৈতিক দলে এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সার্ভিসের ভিতর অনুপ্রবেশ করেন এবং এই সব প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিজেদের ঈপ্সিত সমাজ-সংস্কার কার্যকর করার প্রয়াস করেন।

সিণ্ডিক্যালিজম

সকলেই কিন্তু এইভাবে শ্লথ গতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহী হতে পারে না। বিশেষতঃ যুবকরা চায় উত্তেজনা, জাঁকজমক, হৈচৈ এবং আড়ম্বর। এইজন্য একদিকে সংস্কারপন্থী মনোভাব বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে একদল উত্তেজনাপ্রেমী "বোহেমিয়ান" বিপ্লবীরও সৃষ্টি হল এবং তারাই ক্রমশঃ সিণ্ডি-ক্যালিজম ও গিল্ড সোশালিজমের প্রবর্তন করল। সিণ্ডিক্যালিস্ট চিন্তানায়কদের ভিতর জর্জ সোরেল (১৮৪৭-১৯২২), হুবার্ট ল্যাগারডেল এবং গুস্টাভ হার্ভের (১৮৭১-১৯২২) নাম উল্লেখ-যোগ্য। রাষ্ট্রদ্বেষী সিণ্ডিক্যালিস্টরা মার্কসবাদের "বামপন্থী সংশোধনের" জন্য মার্কসবাদ থেকে এর অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটাই করে "মার্কসবাদকে মার্কসবাদী পদ্ধতিতে সংশোধন" করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক দল নানা আদর্শের জোড়াতালি মাত্র—

এই যুক্তিতে এঁরা এর পরিবর্তে কেবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কারণ শ্রমিক সঙ্ঘই একমাত্র যথার্থ শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান। এইভাবে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করে তার দ্বারা ব্যাপক সর্বাত্মক ধর্মঘটের আয়োজন করে সিণ্ডিক্যালিস্টরা বিরোধীদের পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর উপর থেকে চিন্তা করার দায়িত্ব অপসারিত করে যত্র-তত্র হিংসাত্মক সংগ্রাম দ্বারা বুর্জোয়াদের পরাভূত করা ছিল এঁদের লক্ষ্য। সিণ্ডিক্যালিস্টরা বিপ্লব আনয়নের জন্য অগণিত জনতা অপেক্ষা ক্ষমতালাভেচ্ছু মুষ্টিমেয়-সংখ্যক ব্যক্তিদের পুরুষকারের উপরই বিশ্বাস করতেন বেশী।

গিল্ড সোশালিজম

ইংলণ্ডের গিল্ড সোশালিস্টরাও রাষ্ট্র-বিরোধী। তাঁদের মতে গিল্ড বা সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে নূতন করে অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। উৎপাদনকারী শ্রমিকরাই নিজেদের যাবতীয় কার্য-কলাপের পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনা করবে। ইতঃপূর্বে প্রায় প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রীই শ্রমিকদের মূলতঃ নাগরিক ও উপভোক্তা রূপে দেখেছিলেন। গিল্ড সোশালিস্টরা তাদের উৎপাদক ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সমাজবাদের একটি বড় অপূর্ণতা দূর করেন। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই একাধিক ব্যক্তিত্ব থাকে। মানুষের কোন বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করলে কোন দর্শন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে উৎপাদনকারীর গণতন্ত্রে রূপায়ণ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির "একাধিক ব্যক্তিত্বের" ভিত্তিতে বিভিন্নমুখী কর্মক্ষমতাকে স্বীকার করা সমাজবাদী আন্দোলনে এঁদের প্রকৃষ্ট দান।

পরিণত ও অপরিণত বিপ্লব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোজা লুক্জেমবুর্গ (১৮৭০-১৯১৯) লেনিনেরই সমসাময়িক এবং সমাজবাদী চিন্তাধারার বিকাশে

তাঁর অবদানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লেনিন এক সফল বিপ্লবের নায়ক হওয়ায় ইংরেজী Nothing succeeds like success প্রবাদ-বাক্য অনুযায়ী আজ লেনিনেরই জয়-জয়কার এবং লুক্‌জেমবুর্গ একরকম বিস্মৃত। বিশ্বে নববিধান প্রবর্তকদের মত ও পথ সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা যাঁদের আছে তাঁদের কিন্তু লুক্‌জেমবুর্গকে ভুললে চলবে না। অবশ্য তাঁর বক্তব্য আলোচনা করার পূর্বে পরিণত ও অপরিণত বিপ্লব সম্বন্ধে ঈষৎ চর্চা প্রয়োজন।

মার্কসের মতে পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই কেন্দ্রিত হতে থাকে এবং কয়েকজন ধনী ও শিল্পপতি কোন না কোন প্রকারে সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থার মালিক হয়ে পড়ে। এইভাবে উৎপাদন কার্য ক্রমশঃ সমাজীকরণের দিকে এগিয়ে যায় এবং শ্রমিকরা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও নবীন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। এই সমস্ত কারণ বিপ্লবোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে ও এর পর যে বিপ্লব হয় তারই নাম পরিণত বিপ্লব। সংশোধনপন্থীদের ভয় এই যে, অপরিণত অবস্থায় অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবার পূর্বে এই বিপ্লব শুরু করলে তার পরিণাম মারাত্মক হবে। রোজা লুক্‌জেমবুর্গের বক্তব্য হচ্ছে, "পরিণত সামাজিক অবস্থার দিক থেকে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণী এত 'সত্বর' ক্ষমতা দখল করতে পারে না; কিন্তু ক্ষমতা সংরক্ষণের রাজনীতির দিক থেকে চিন্তা করলে 'অতি সত্বরই' তাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। কারণ, প্রথমতঃ আমরা বিশ্বাস করি না যে, সর্বহারা শ্রেণী রাতারাতি ক্ষমতা দখল করে পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতন্ত্রী সমাজে পরিণত করতে পারবে।... সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনির্বাণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সে সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণী একাধিকবার ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। সুতরাং চূড়ান্ত জয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপের দিক থেকে 'যত সত্বর' সম্ভব সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত।"

মার্কসের মত লুক্‌জেমবুর্গও সমাজে সংকটের পর সংকট দেখেছেন।

কিন্তু তার মধ্য দিয়ে হঠাৎ সেই "চরম দিনের আগমন প্রতীক্ষা না করে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর অনির্বাণ সংগ্রাম ও ক্রমবর্ধমান বিচক্ষণতার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিপ্লবের এক "বিশেষ দিনে" এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান, একটি সর্বাত্মক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন না দেখে তিনি প্রাত্যহিক সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়ে সমাজবাদী বিপ্লবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারাই গণচেতনা সৃষ্টি হয়ে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন সর্বব্যাপক হয়ে পড়বে এবং এই গণচেতনা শোষক শ্রেণীর সমাধি রচনা করবে। লুক্সেমবুর্গের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-সংগ্রামে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে নেতা ও জনতার ব্যবধান ঘুচে যাবে এবং জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টাতেই সংগ্রাম পরিচালনা করবে ও নেতারা হবে[৮] "জনসাধারণের কার্যকলাপের বাহক মাত্র"।

গ্রন্থপঞ্জী

Roads to Freedom	বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল
Democratic Socialism	অশোক মেহতা
A History of Socialist Thought	জি. ডি. এইচ. কোল
নৈরাজ্যবাদ	ড. অতীন্দ্রনাথ বসু

॥ ৭ ॥

নব-মানবতাবাদ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মানুষের চিন্তাধারায় বহু নবীন মূল্যবোধের সৃষ্টি হল এবং এর ফলস্বরূপ কেবল সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেই নবযুগের আবির্ভাব হয় নি—রাজনীতির ক্ষেত্রেও নূতন বিচারধারার প্রভাব পড়ল। ইউরোপের এই ভাববিপ্লবের নাম রেনেসাঁস (Renaissance) এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের যাবতীয় কাজকর্মকে মানবকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত করা। মানবতবাদের জন্মও এই রেনেসাঁসের গর্ভ থেকে।

বিগত দুই শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সম্ভবতঃ এর প্রভাব গণতন্ত্রের উপরেই সবচেয়ে বেশী পড়েছে। আজকের গণতন্ত্রে সকল নাগরিকদের একটা ন্যূনতম মৌলিক অধিকার দেবার যে আদর্শ স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত, তার পিছনে মানবতাবাদী বিচারধারার যথেষ্ট অবদান আছে। এছাড়া মানবতাবাদের এক বিশিষ্ট রূপ এই ভারতবর্ষেরই এক প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (এম. এন. রায়) রচনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই বিচারধারাকে "নিউ হিউম্যানিজম" বা নব-মানবতাবাদ আখ্যা দিয়েছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম

নব-মানবতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে শ্রীযুক্ত রায়ের মানসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জানার জন্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশ থেকে ইংরেজের শাসন দূর করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা প্রচলিত ছিল। শ্রীযুক্ত রায় সেই সব সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম ছিলেন। এছাড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য ইংরেজের শত্রু রাষ্ট্রদের

কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর কার্যকলাপের জন্য মানবেন্দ্রনাথের উপর সরকারের রোষদৃষ্টি পতিত হয়েছিল। এইজন্য মানবেন্দ্রনাথ স্বদেশ ছেড়ে এসিয়া, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে রাশিয়ায় উপনীত হলেন। ইতোমধ্যে অবশ্য তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা যাবে না এবং এ পথে যথার্থ ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তগতও হবে না। তাছাড়া মেক্সিকোতে থাকাকালীন তিনি শ্রমিক-সংগঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্য সংগঠন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করে মার্কসীয় গণবিপ্লবের নীতিতে আস্থাশীল হন। রাশিয়ায় উপনীত হয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় সংগঠনী শক্তির জন্য শীঘ্রই তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিনের অন্যতম সহকারী রূপে পরিগণিত হন। কেবল রাশিয়ার শিশু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা ও সুদৃঢ় করাই নয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলিতে কমিউনিজম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি দীর্ঘকাল যাবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি ও অপরাপর লেনিনের এককালীন সহকর্মীর মত তিনিও একচ্ছত্র ক্ষমতাকামী স্ট্যালিনের রোষদৃষ্টিতে পতিত হন। এর ফলে কেবল যে তাঁকে রাশিয়াই ছাড়তে হল তা নয়, যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক একদা তাঁর সেবাযত্নে পুষ্ট হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানও তাঁর কূট সমালোচনা করতে থাকে। এই সবের ফলে মানবেন্দ্রনাথের মনে মার্কস্‌বাদ এবং বিশেষতঃ তার ফলিত রূপ— কমিউনিস্ট সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মৌলিক অনাস্থার ভাব সৃষ্টি হল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তিনি মানবমুক্তির ভিন্ন কোন পন্থা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এক দিকে দর্শন বিজ্ঞান ও রাজনীতি-শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অপর দিকে রাশিয়া চীন মেক্সিকো ও ইউরোপ আমেরিকার আরও অনেক দেশের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে মানবেন্দ্রনাথের মানসলোকে যে নূতন বিচারধারার উদ্‌গম হল তারই নাম "নব-মানবতাবাদ"। জীবনের

শেষ কয়েক বছর তিনি ভারতবর্ষে বাইশটি সূত্রে বিধৃত এই নব-মানবতাবাদের প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সমগ্র বিশ্বের নব-মানবতাবাদীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যও তাঁর ছিল; কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

নব-মানবতাবাদের মূল তত্ত্ব

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক পিথাগোরাস বলেছিলেন, "মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড।" পিথাগোরাসের এই অমর বাণী নব-মানবতাবাদীদের বিচারধারার বীজ স্বরূপ। মানুষকেই সব কিছুর মূলাধার রূপে স্বীকার করার জন্য নব-মানবতাবাদী এক দিকে ঈশ্বর অর্থাৎ মনুষ্যেতর অপর কোন মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না এবং অন্য দিকে তাঁরা মৌমাছিতন্ত্রের আধুনিক রূপ মার্কস্‌বাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও অগ্রহণীয় বলে মনে করেন। নব-মানবতাবাদীরা বলেন যে, মার্কস্‌বাদী স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তির পরাধীনতা এবং এই জাতীয় স্বেচ্ছায় পরাধীনতা স্বীকারকারী ক্রীতদাসদের সমাজ একমাত্র কল্পনা ও প্রচার-সাহিত্যে ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে কখনও স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না।

নব-মানবতাবাদী সর্বহারার একনায়কত্ব ও অন্তিমে রাষ্ট্রের আত্ম-অবিলুপ্তি ইত্যাদি কমিউনিস্ট আদর্শকে অবাস্তব ও অবাঞ্ছণীয় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রকেও মানব-বিকাশের পক্ষে অপর্যাপ্ত জ্ঞান করেন। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, যদিও বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পিছনে মানবতাবাদী প্রেরণা ক্রিয়াশীল, তবুও তার প্রচলিত স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর "পলিটিক্স পাওয়ার অ্যাণ্ড পার্টিজ" গ্রন্থে (পৃঃ ৫০) বলেছেন, "ফরাসী বিপ্লবের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের যে আদর্শের কথা কল্পনা করেছিলেন তা হল প্রাচীন গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। তাঁদের সে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছিল ছোট ছোট

নগর-সাধারণতন্ত্রে, যার জনসংখ্যা সম্ভবতঃ দশ বিশ হাজারের বেশী ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়ে লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর আবাসস্থল সমগ্র দেশ রাষ্ট্র পদবাচ্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং গ্রীসে যেভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চলেছিল এই পরিস্থিতিতে তা চলা সম্ভবপর হল না বলে রুশো অবিলম্বে এর বিরোধী হলেন।" বর্তমান গণতন্ত্রের অপূর্ণতা সম্বন্ধে নব-মানবতা-বাদের প্রবক্তারা আর যা বলেন তা এই পুস্তকের প্রারম্ভে বর্ণিত কারণের অনুরূপ।

এইজন্যই নব-মানবতাবাদের প্রবক্তারা রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচন ও শাসনব্যবস্থার বিরোধী। কারণ নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ালে ভোটার ও প্রার্থীর মধ্যে যেটুকু ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কোন রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনীত করলে বা নির্বাচন পরিচালনা করলে তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। শ্রীযুক্ত রায়ের মতে সেই সময়, "এক দিকে থাকে নৈর্ব্যক্তিক জনসমষ্টি (mass) ও অপর দিকে থাকে রাজনৈতিক দল সমূহ। ব্যক্তি-মানুষ, তার বিচারবুদ্ধি, তার কর্ম-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ইচ্ছার কোন স্থান কুত্রাপি থাকে না।" এই জন্য নব-মানবতাবাদের প্রবক্তারা সর্বোদয়ে বিশ্বাসীদের মতই বহুল পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে বিশ্বাসী। এই বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক ও আর্থিক—উভয় ক্ষেত্রেই করতে হবে। অর্থাৎ নব-মানবতাবাদীরা দলবিহীন গণতন্ত্রের সমর্থক।

নব-মানবতাবাদ ও সর্বোদয়

নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নব-মানবতাবাদীরা প্লেটোর মতই লোকশিক্ষার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী। দলবিহীন নির্বাচন-ব্যবস্থা লোকশিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। এই পুস্তকের শেষ ভাগে "অদলীয় গণতন্ত্র" ও "নির্বাচন ব্যবস্থা ও শাসন-মুক্ত সমাজ" শীর্ষকে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভোটারদের

কমিটির কাজ কেবল নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, এই প্রকারের কমিটি এক নির্বাচন থেকে অপর নির্বাচনের মধ্যেকার সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মারফত ভোটার ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে। এর দ্বারা লোকশিক্ষার কাজও সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে।

সর্বোদয়ের মত নব-মানবতাবাদও মনে করে যে, যথার্থ গণতন্ত্রের জন্য কেবল সরকারী ও বিরোধী দলের অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়। কারণ উভয় প্রকারের দলেরই অন্তিম লক্ষ্য হল ক্ষমতাপ্রাপ্তি। নব-মানবতাবাদী সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য জননায়ক বা লোক-শিক্ষকের ভূমিকার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী। লোকশিক্ষক স্বয়ং কখনও নিজের জন্য ক্ষমতা বা পদ চাইবেন না, তিনি কোন প্রকারের নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। ক্ষমতাদ্বন্দ্বের বাইরে থেকে তিনি জনমতকে শিক্ষিত করে তুলবেন। এই জন্যই মানবেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে নিজ রাজনৈতিক দল—র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভেঙ্গে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, অতঃপর নব-মানবতাবাদ এক জন-আন্দোলনের আকার ধারণ করবে।

যে কালে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর বক্তব্য সহজে স্বীকৃত হত, মানবেন্দ্রনাথ তার অনেক পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য বহু সমাজ-সংস্কারকের মত তাঁর মতবাদও বহুজনমান্য হয় নি। স্বয়ং প্রথম শ্রেণীর কর্মযোগী হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মহলেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। গান্ধী-বিনোবার মত সর্বসাধারণের সঙ্গে সমরস হয়ে কোন জন-আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ বিচারধারার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কার্যসূচি গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় নব-মানবতাবাদের প্রভাব দেশের জনমতের উপর নেই বললেই চলে। কিন্তু তার জন্য মানবেন্দ্রনাথের নব-মানবতাবাদের মতবাদের মূল্য কমে যায় না। প্রত্যুত নব-মানবতাবাদ রাজনীতি শাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমান শতাব্দীর এক মৌলিক অবদান। এবং সর্বোদয়ের সঙ্গে নব-মানবতাবাদের যে

অধ্যাত্মবাদ বনাম জড়বাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক মতভেদ বিদ্যমান, তাকে আপাততঃ বিস্মৃত হয়ে উভয় মতবাদের প্রবক্তারা বহুক্ষেত্রে মিলিত ভাবে কাজ করতে পারেন। কারণ নব-মানবতাবাদ ও সর্বোদয়ের ভিতর অমিলের থেকে মিলের পরিমাণই বেশী।

গ্রন্থপঞ্জী

New Humanism—A Manifesto	মানবেন্দ্রনাথ রায়
Reason, Romanticism and Revolution	„ „
Politics, Power and Parties	„ „
মানবেন্দ্রনাথ—জীবন ও দর্শন	স্বদেশরঞ্জন দাস
মৌমাছিতন্ত্র	শিবনারায়ণ রায়
র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম	অনুঃ বসুধা চক্রবর্তী

॥ ৮ ॥

সর্বোদয়ের কথা

গান্ধীজীর পটভূমিকা

পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীকে বিচার করতে হবে। গান্ধীজীর বিচারধারা কোনরকম পূর্বাপর-সম্বন্ধবিবর্জিত স্বয়ম্ভূ মতবাদ নয়। অপর সকল মনীষীদেরই মত দেশ এবং কালের প্রভাব গান্ধীজীর উপরও পড়েছে। অতীতের ভুল-ত্রুটী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন পথ খোঁজাটাই নিয়ম। এ নিয়ম আর সকলের মত গান্ধাজীর বেলায়ও প্রযোজ্য।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে যদি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়, তবে মনে হয় তাঁকে সমাজ-বাদীর চেয়ে বরং নৈরাজ্যবাদীদের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেবল বিচারধারাই নয়, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দিক থেকে দেখতে গেলেও এ কথার সমর্থন মেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজী পশ্চিমের "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের" আদি প্রবক্তা হেনরি ডেভিড থোরো দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে তার পূর্বেই টলস্টয়ের জীবনাদর্শ যে গান্ধীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এ কথা সকলেই জানেন। তবে নিজের জীবনায়নকে একটি মাত্র শব্দে অভিব্যক্ত করার জন্য তিনি "সর্বোদয়" নামক যে শব্দটিকে গ্রহণ করেছিলেন, তার মূল খুঁজতে গেলে ইংরেজ মনীষী জন রাস্কিনের 'আন টু দিস লাস্ট' নামক গ্রন্থখানির শরণ নিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে এই গ্রন্থখানি গান্ধীজী পাঠ করেন এবং এর বক্তব্য তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করে। পুস্তকটির সারাংশ গুজরাতীতে অনুবাদ করার সময় তিনি এর নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। ভারতের বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-সাধনার দুই স্রোত—বেদান্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম—গান্ধী-মানসের পটভূমি, এবং

তার উপর পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার দুই প্রবল প্রবাহ গণতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের রঙ দিয়ে গান্ধীজীর জীবন-দেবতা যেন তাঁর জীবন-দর্শনকে চিত্রায়িত করেছিলেন।

গান্ধীজী ও রাষ্ট্র

গান্ধীজীকে ঠিক অভিধানগত অর্থে মার্কস্ ইত্যাদির মত পণ্ডিত আখ্যা দেওয়া চলে না। কারণ পুঁথি-পত্র ঘেঁটে গবেষণা করে কোন বিশেষ ব্যাপারে নিজের অভিমত থিসিসের আকারে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব গান্ধীজী দাবি করতে পারেন না। কার্ডিন্যাল নিউম্যানের "ওয়ান স্টেপ এনাফ ফর মি" বা পরবর্তী পদক্ষেপই যথেষ্ট—এই সত্য তাঁর ক্ষেত্রে প্রখররূপে ভাস্বর। কারণ তাঁর অভিমত কোন মতবাদের আকারে পেশ না করে তিনি প্রত্যক্ষ কাজ করতে করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যখন যে সত্যের সন্ধান লাভ করতেন, তাকেই তাঁর অভিমত আখ্যা দিতেন। যাই হোক, আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে যখন ভারতবর্ষে প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে বিশেষ কেউ চিন্তাও করেন নি, গান্ধীজী তখনই বিধিবদ্ধভাবে তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিচারধারা বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। প্রত্যুত, গান্ধীজীর বিচার-ধারার মূল সূত্র উপলব্ধি করার জন্য ১৯০৮ সনে লিখিত তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' নামক পুস্তকটি অপরিহার্য। ক্রান্তদর্শী গান্ধীজী ওই অত দিন পূর্বেই ইংরেজ-প্রবর্তিত রাজ্য-ব্যবস্থা বজায় রেখে কেবল ইংরেজ বিতাড়নের প্রয়াসে সফল হলে তার পরিণামে কী হবে তা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "এর মানে তো এই যে, আপনার ইংরেজী রাজ্য চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চান, বাঘটাকে চাই না।" (হিন্দ্ স্বরাজ)।

রাষ্ট্র এবং তার সর্বময় কর্তৃত্বের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিচারধারা পরিণত হতে লাগল। ১৯৩৫ সনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিটি প্রচেষ্টা আমি

অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে দেখে থাকি। কারণ বাইরে থেকে এ প্রচেষ্টার পরিণাম শোষণের হ্রাস করে মানুষের কল্যাণ সাধন বলে মনে হলেও যাবতীয় প্রগতির মূলাধার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের (individuality) বিনাশ সাধন করে বলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রত্যুত মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণকারী।" "রাষ্ট্র হচ্ছে ঘনীভূত এবং সুসংগঠিত হিংসার প্রতিনিধি। ব্যক্তি-মানবের আত্মা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র আত্মার অস্তিত্ববিহীন এক যন্ত্র বলে এর অস্তিত্বের জীবনকাঠি হিংসার প্রভাব থেকে একে মুক্ত করা কদাচ সম্ভব নয়।" "দণ্ডশক্তি-আধারিত প্রতিষ্ঠান আমি চাই না, রাষ্ট্র এই-জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। তবে সমাজে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার আধারে গঠিত প্রতিষ্ঠান তো থাকবেই।"

গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য

অবশ্য এ কথা যথার্থ যে, রাষ্ট্রকর্তৃত্ববিহীন সমাজের কথা বলে গান্ধীজী বিশ্বকে কোন নূতন লক্ষ্যের নির্দেশ দেন নি। কারণ আমরা দেখেছি যে, তাঁর পূর্ববর্তী বহু মনীষীই এই আদর্শের কথা উচ্চারণ করে গেছেন। তবে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী নৈরাজ্যবাদীদের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গান্ধীজী কেবল বক্তৃতা, বিবৃতি বা পুস্তিকা প্রকাশ দ্বারা রাষ্ট্রকর্তৃত্ববিহীন সমাজের কথা ঘোষণা করে ক্ষান্ত থাকেন নি। অথবা পরিকল্পনাবিহীন ভাবে রাষ্ট্রশক্তির বাহ্য প্রতীকের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা করে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ করার কথাও তিনি চিন্তা করেন নি। নিজ আদর্শের সমর্থনে তিনি এক প্রবল জন-আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এ আন্দোলন মূলতঃ ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হলেও, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বেদীমূলে গান্ধীজী কখনও তাঁর সামাজিক নববিধানের আদর্শ বলি দেন নি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর সমাজ সম্বন্ধীয় বিচারধারা প্রাঞ্জলভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, "শ্বেতাঙ্গদের সামরিক শাসনের

পরিবর্তে কৃষ্ণকায়দের জঙ্গী বিধান কায়েম করাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তা হলে তা নিয়ে এত হৈ চৈ করার মানে হয় না। আর যাই হোক না কেন, দেশের জনগণের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। দেশীয়দের সামরিক শাসনের আওতায় জনসাধারণের অবস্থা আজকের চেয়ে খারাপ হবারই সম্ভাবনা, আর নেহাত যদি তা নাও হয়, তবে বর্তমানেরই মত নিগ্রহ তাদের বরাতে থাকবে।" (১৯-১২-১৯২৯)। কারণ তাঁর কাছে "বিদেশী বা স্বদেশীয় যে সরকারই হোক না কেন, স্বরাজের অর্থ হচ্ছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার অখণ্ড প্রচেষ্টা।" (৬-৮-১৯২৫)। এই ভাবে 'হিন্দ্ স্বরাজ্যে' সর্বপ্রথম উচ্চারিত গান্ধীজীর নবীন সমাজের কল্পনা বিকশিত হতে হতে ক্রমশঃ পূর্ণাভিমুখে এগিয়ে চলল।

গঠনমূলক কার্যক্রম

গান্ধীজী কর্তৃক প্রারব্ধ গণ-আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গঠনমূলক কার্যক্রম। গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্য ঘোষণা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন, "গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি হচ্ছে সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের সাধন। এর পরিপূর্ণ রূপায়ণই পূর্ণ স্বাধীনতা। জাতিকে বুনিয়াদ থেকে উপর পর্যন্ত গড়ে তোলার জন্য এই যে গঠনমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, একে পূর্ণতঃ সাকার করার জন্য চল্লিশ কোটি দেশবাসী কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে—এই দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন। এ কথায় কেউ কি সংশয় প্রকাশ করতে পারেন যে এর অর্থই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা? এমন কি বিদেশী শাসনের বিলোপও এর ভিতর পড়ে।

"পাঠক মনে মনে গঠনমূলক কার্যক্রমের সমস্ত দিক কল্পনা করুন, তা হলেই তিনি আমার সঙ্গে সহমত হবেন যে, এই কার্যসূচীকে যদি সাফল্য সহকারে রূপায়িত করা যায়, তা হলে এর পরিণতি হচ্ছে আমাদের সকলের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা।" ('গঠনমূলক কার্যক্রম' নামক পুস্তিকার ভূমিকা, ১৯৪৫)

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রথমে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে তার পর সেই শূন্যতার উপর নববিধানের ইমারত খাড়া করার কোন অবাস্তব পরিকল্পনা গান্ধীজীর ছিল না। তিনি যে ব্যবস্থার পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে এই গঠনমূলক কার্যক্রম দ্বারা গান্ধীজী তাঁর বাঞ্ছিত বিকল্প—নবীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছিলেন। এই ভাবে অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ, অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মারফত গান্ধীজী তাঁর নবীন সমাজের ঋত্বিক স্বরূপ আদর্শ স্বরাজ গঠনের উপযুক্ত এক দল নিষ্ঠাবান কর্মী তৈরী করলেন এবং জনসাধারণের ভিতর এই সব প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর মাধ্যমে শাসনবিহীন সমাজের আদর্শ জনপ্রিয় হতে লাগল।

মার্কস ও গান্ধী

গান্ধীজীর পূর্বে একাধিক সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী তাঁদের রাষ্ট্রবিহীন সমাজ সম্পর্কিত বিচারধারা ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের কারও কারও পন্থা অনুযায়ী নূতন সমাজ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে মার্কসের প্রভাব সর্বাধিক। তিনিও শেষ অবধি রাষ্ট্রকর্তৃত্ববিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। আমরা জানি যে, তাঁর মতে সমাজ থেকে শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে গেলে রাষ্ট্র বা সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী কর্তৃক সর্বহারা শ্রেণীকে শাসনের নামে শোষণ করার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অদৃশ্য হবে। কারণ শ্রেণীহীন সমাজে কে আর কার উপর শাসন করবে? আপাতদৃষ্টিতে কথাটি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হলেও প্রত্যুত এ যুগে এই ঘোষণার ব্যর্থতার জন্যই গান্ধীজীর পদ্ধতি সম্পর্কে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং মার্কসের পূর্বোক্ত বক্তব্যের একটু সবিস্তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক সত্য বনাম বাস্তব সত্য

কলকাতা থেকে বোম্বাইগামী কেউ যদি বলেন যে তিনি পশ্চিম দিকে না গিয়ে পূর্ব দিকে যাবেন, তা হলে যুক্তির দিক থেকে তাঁকে নিরস্ত করা চলে না। কারণ যে হেতু পৃথিবী গোল, পূর্ব দিকে চলতে চলতে কোন না কোন দিন তিনি নিশ্চয়ই বোম্বাই পৌঁছবেন। কিন্তু কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বোম্বাইযাত্রী নিশ্চয় পূর্ব দিকে চলা শুরু করবেন না, তিনি পশ্চিম দিকেই যাত্রা করবেন। মার্কসের কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ভ্রান্তি নেই যে, বুর্জোয়া দলনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে একদা রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে। কারণ পূর্ণত্বের পর পঞ্চত্বপ্রাপ্তিই বৈজ্ঞানিক বিধান।

কিন্তু কোন বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবী ওই পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ মার্কসের পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হলে প্রথমতঃ বর্তমান রাষ্ট্রপরিচালকদের হাত থেকে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে ক্ষমতা দখলের উপযুক্ত এক শক্তিশালী সুসংগঠিত (শতবিধ পার্টি-ডিসিপ্লিন সহ) রাজনৈতিক দল চাই। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রামকেও কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে। রাষ্ট্র ওই রূপ এক বলশালী পার্টির অধীন হবার পর শাসন ও বিচার বিভাগ ছাড়াও জনসাধারণের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসগৃহ, অর্থাৎ এক কথায় নাগরিকের মাতৃগর্ভে আবির্ভাব থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যাবতীয় আর্থিক ও সামাজিক কৃত্যের দায়িত্ব একমাত্র ওই রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। ক্ষমতার স্বধর্ম আত্মহত্যা করা নয়, ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণই এর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এইরূপ অমিত শক্তিশালী রাষ্ট্র ও তার কর্ণধার স্বরূপ প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রিত একটি পার্টি যে কোন দিন সত্যসত্যই আত্ম-বিলোপ করবে—এ কথা একান্তভাবেই কবি-কল্পনা। ইতিহাস বা মনোবিজ্ঞান কোনটিই এ কথার সমর্থন করে না যে, এক দিন যারা প্রচণ্ড গতিতে একনায়কত্ব চালিয়ে যাবতীয় সমালোচনার কণ্ঠরোধ

করেছিল, তারা অকস্মাৎ এক শুভ লগ্নে সব ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে জনমতের নিকট দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিকদের মত আচরণ করবে। মার্কসের এ কল্পনা যে বাস্তবতার সম্পর্করহিত, সোভিয়েট রাশিয়ার এতদভিমুখী বিগত অর্ধ শতাব্দীর পরীক্ষাই তার জ্বলন্ত নিদর্শন। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর রাশিয়াতে রাষ্ট্র বিলুপ্তির দিকে যাবার পরিবর্তে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় শক্তিশালী হতে হতে সর্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের পরিপন্থী হয়ে পড়েছে। কেবল প্রশাসনের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত চারুকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে রাষ্ট্র কী ভাবে হস্তক্ষেপ করে মানুষের সর্জনশীল শক্তিকে পঙ্গু ও খর্ব করেছে, স্টালিনের মৃত্যুর পর স্বয়ং রাশিয়ার সরকারী কর্তৃপক্ষের জবানবন্দীতেই তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

অপর একটি কারণ

শ্রেণী ও শোষণের কারণ সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্যেও সংশোধনের অবকাশ আছে। মার্কস্ মনে করতেন যে, উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলোপ হলে সমাজে সর্বহারাদের একটি মাত্র শ্রেণী থেকে যাবে এবং সেই শ্রেণীহীন সমাজে তাই শাসনেরও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কিন্তু মার্কস্ এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, মালিকদের প্রভাবের অবসান ঘটালেই সমাজ শ্রেণী-বিহীন হয় না। প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত নয়, এমন সব ব্যবস্থাপক শ্রেণী ও আমলা-গোষ্ঠী উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক না হয়েও তার নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে এবং বুর্জোয়াদের মতনই, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে তাদের চেয়েও বেশী মাত্রায়, শোষণকারী হতে পারে—এ কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেন্দ্রিত উৎপাদন ও প্রশাসন-ব্যবস্থার এই আধুনিক পরিণাম মার্কস্ কেন, বিগত শতাব্দীর কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। আমলা-তন্ত্রের প্রভাব যে মার্কস্‌বাদের অনুসরণকারী রাষ্ট্রেও কী বিষম পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে—সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন প্রভৃতি

কমিউনিস্ট দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকারোক্তিতে মাঝে মাঝে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে এ সমস্যার আরও আলোচনা করা হবে বলে এখানে কেবল এইটুকু উল্লেখ করে রাখা হল।

সৈদ্ধান্তিক ত্রুটী

মার্কসের শাসনমুক্ত সমাজ স্থাপনার পদ্ধতি সংক্রান্ত বক্তব্যের কয়েকটি সৈদ্ধান্তিক ত্রুটী বা অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কালের প্রভাবে মার্কসবাদের অনেক মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ বিষয় (axioms) ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা, তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে। তবে এখানে সে সব বিষয়ের আলোচনা না করে তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্ত মতবাদের সিদ্ধান্তগত অপূর্ণতার চর্চা করা হবে; কারণ এই গ্রন্থের আলোচনার পরিধি ওর মধ্যেই সীমিত। যাই হোক, মার্কসীয় যুক্তিবিন্যার এই সব ফাঁক যে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারার অন্যতম কারণ নয়, এ কথা জোর করে বলা চলে না। যে দ্বান্দ্বিক নিয়মের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ সাম্যবাদে রূপান্তরিত হতে বাধ্য বলে মনে করা হয়, লক্ষ্যে উপনীত হবার পর অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার কী হয়? মার্কস্ কথিত এই শাশ্বত বিধানেরও কি আত্ম-অবলুপ্তি ঘটে? মার্কস্বাদীদের মতে শ্রেণী-সংঘর্ষই সমাজ-পরিবর্তনের প্রেরক-শক্তি। কিন্তু সাম্যবাদী অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তো আর শ্রেণী-সংঘর্ষের অবকাশ থাকে না। তা হলে তারপর মার্কস্ কথিত পরবর্তী ধাপ বা "সামাজিক বিবর্তন" অথবা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণবিহীন সমাজ-ব্যবস্থা আসবে কী করে? মার্কস্বাদে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে থিসিস, অ্যান্টিথিসিস এবং সিন্থেসিসের প্রক্রিয়ার উপর অটল আস্থা স্থাপন করা হয়। এতদনুসারে সমাজের ভাব ও সংগঠনের রাজ্যে প্রথমে বিবর্তনমূলক বিকাশ দেখা যায়। তারপর এর অ্যান্টিথিসিস বা স্ববিরোধ দেখা দেয় এবং

তার পরিণামে প্রথমোক্ত বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে এক সিন্থেসিস বা সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন একটি থিসিসের বিশেষ একটি অ্যান্টিথিসিসই হবে কেন, একাধিক অ্যান্টিথিসিসও তো হতে পারে। আর তা হলে তার সিন্থেসিস বা সমন্বয়ও তো একরকম হবে না। সুতরাং পুঁজিবাদ থেকে এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার ফলে সাম্যবাদই সৃষ্টি হবে এ কথা জোর করে বলা চলে না। প্রত্যুত, জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের জন্ম মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের এই ভ্রান্তির ঐতিহাসিক নজির। এ ছাড়া, মার্কস্‌বাদীদের মতে মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক প্রেরণায় কর্মে প্রবুদ্ধ জড় ও বস্তুপিণ্ড মনে করাও এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ও সমস্যাকে অতিমাত্রায় সরল করে চিত্রিত করার উৎকট আগ্রহের দ্যোতক। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন এবং জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিও ব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে থাকে। মার্কস্‌বাদের এই সব মৌলিক বিশ্বাসের সমালোচনার যথোচিত প্রত্যুত্তর এখনও মার্কসের অনুবর্তীরা দিতে পারেন নি।

কাল নয়, অদ্য

অতএব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণবিহীন সমাজ কাম্য হলে এইখানে এখনই (here and now) তার সূত্রপাত করতে হবে। আজ এই মুহূর্ত থেকেই সে লক্ষ্যাভিমুখে চলা শুরু করতে হবে, যাতে প্রতিটি দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন কিঞ্চিৎ মাত্রাতেও মূল লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারি। কোন্ এক স্বর্ণযুগে রাষ্ট্রের অধীনতা-পাশ মুক্ত হওয়া যাবে, এই মায়া-মরীচিকার ছলনায় পড়ে এখন উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করলে কোন দিনই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। এই পথের পথিকদের আগামী কাল অনিশ্চিত এবং আজকের দিনটিকে তাঁরা নির্মমভাবে হত্যা করেন। * গান্ধীজী তাঁর পূর্ববর্তীদের পরিকল্পনার ক্রটী-বিচ্যুতি

* এ যেন "আজ নগদ কাল ধার"-এর মত ব্যাপার।

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁদের বিচারধারার পরিপূরক নবীন কল্পনা বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই তিনি বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল বিপ্লব আবাহনের সাধন বা পন্থাতেও বিপ্লব সংসাধন।

গান্ধীজীর পথ

কিন্তু কেবল শাসনবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধু ইচ্ছা ব্যক্ত করলেই তো আর তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। অথবা রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে সরকারী দপ্তর বা কর্মচারী ইত্যাদি শাসনযন্ত্রের বাহ্য প্রতীকদের উপর সশস্ত্র হামলা করলেও সমস্যার মূলকে স্পর্শ করা যাবে না। সমাজে শাসনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে শাসন-ব্যবস্থারও অস্তিত্ব থাকবে। ভিষগাচার্য গান্ধীজী তাই গোড়া বেঁধে কাজ করার প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন যে, শাসনবিহীন সমাজ রচনা করতে হলে প্রথমে সমাজ থেকে শাসনের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে হবে। এবার তাই বিচার করে দেখা যাক সমাজে শাসনের প্রয়োজনীয়তা থাকে কেন।

শাসনের প্রয়োজনীয়তার মূল

আর্থিক ও রাজনৈতিক—এই দ্বিবিধ কারণে সমাজে শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের আর্থিক জীবন আজ পুঁজি-আধারিত। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য পণ্যসমূহ কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুঁজির সহায়তায় উৎপাদিত ও বন্টিত হয়। ফলে এই উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সঞ্চালকরূপে এক বিরাট্ মধ্যবর্তী স্বার্থের বাহিনী সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবন-কাঠি, মরণ-কাঠি তাদের হাতে থাকে বলে তারা ক্রমশঃ জনসাধারণকে নিজেদের শর্ত মানতে বাধ্য করে। এইভাবে মানুষের স্বাধীনতা তো বটেই, এমন কি নিছক জৈব অস্তিত্বও এই শ্রেণীর করতলগত হবার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও দাপটের নীচে সর্বসাধারণকে কাল কাটাতে

হয়। এ ছাড়া, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ নিরোধ, কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম—সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ও তার সুরক্ষা ইত্যাদি এবং কর সংগ্রহ ও রাজস্ব ব্যয় ইত্যাদির কারণেও যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করতে হয়—এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

রাষ্ট্রীয়করণ—সর্বজ্বরহর বটিকা!

এ সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয়করণকে মহৌষধ বলে বর্ণনা করা হত। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে যে, এতেও সমস্যার সমাধান হয় না। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কর্মীদের কাজের প্রেরণা কমে যায়, পূর্বতন মালিকবর্গ ও পরিচালকদের সংগঠনী শক্তির লাভ থেকে সমাজ বঞ্চিত হয় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকতর ব্যয়বহুল ও অপেক্ষাকৃত শিথিল ও অযোগ্য হয়ে পড়ে, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে যে সব বক্তব্য আছে তার কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, তবু এর দ্বারা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারে-কাছে আসার পথ খুলে যায় বলে দাবি করাও মুশকিল। তাই উৎপাদন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে আধুনিক সমাজবাদীদের অভিমত বিশেষ মূল্যবান। ব্রিটিশ লেবার পার্টির একদল মনস্বী কর্মী সমাজবাদের ক্রমবিকাশের ধারা ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী সোশালিজম' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত মনোরম আলোচনা করেছেন। রাজনীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি পাঠকের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থে সমাজবাদীদের আশা-ভরসার স্থল রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে :

"......বহুদিন যাবত যৌথ মালিকানাকেই সমাজবাদী অর্থ-ব্যবস্থা রচনা করার এক অপরিহার্য ও পর্যাপ্ত শর্ত বিবেচনা করা হত। কয়েকটি মাত্র শিল্প-ব্যবসায়ের যৌথ স্বামিত্ব নয়, প্রত্যেকটি উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-ব্যবস্থার পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণই সমাজবাদীদের কাম্য ছিল। অর্থাৎ সমাজবাদী ঐতিহ্যে আর্থিক ক্ষমতা (economic power) হস্তান্তরের প্রতিই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণের প্রতি এর তুলনায় অনেক কম মাথা ঘামানো হয়েছে। অবশ্য এ কথা বলা হচ্ছে না যে, এ সমস্যাটি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে এ কথা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সমবায় সমিতি, শ্রমিক সঙ্ঘ, বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী (guilds), বৈপ্লবিক অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রভৃতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে তার নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আপনা থেকেই মিটে যাবে।

"নিছক অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্বতঃসিদ্ধ অনুমান গড়ে ওঠে নি। তদানীন্তন কালের প্রচণ্ড আশাবাদী তত্ত্ব-দর্শন সমূহ দ্বারা এই বিশ্বাস সমর্থিত হয়েছিল। বিপ্লবপন্থী সমাজবাদীরা মার্কস্‌বাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। মার্কসীয় তত্ত্ব তাঁদের এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, পুঁজিপতিদের একবার বিনষ্ট করতে পারলেই আর্থিক শ্রেণী সমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর রাজত্ব করার সাধন বলে তখন এরও 'আত্ম-অবলুপ্তি' ঘটবে। 'সর্বহারার একনায়কত্বের' পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদ স্থাপিত হবে এবং এর আওতায় কারও এমন কোন ক্ষমতা থাকবে না, যদ্দ্বারা সে তার প্রতিবেশীর উপর কর্তৃত্ব করে এর অসদুপযোগ করতে পারে। অপর পক্ষে, গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদীদের ভিত্তিমূল ছিল গণতন্ত্রের তত্ত্ব। এতদনুযায়ী মনে করা হত যে, ভোটের দ্বারাই আর্থিক ক্ষমতাকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মালিকানার ক্ষমতা রাষ্ট্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ অথবা উভয় প্রতিষ্ঠান বা অপর যে কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের কাছেই হস্তান্তরিত করা হোক না কেন, এই ক্ষমতা পরিচালনা করার সময় যাতে এর অসদুপযোগ না হয় তার জন্য ক্ষমতার সঞ্চালক, বা তারা যে কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী তাদের, নির্বাচন করার ব্যবস্থাকে যথেষ্ট রক্ষা-কবচ বলে বিবেচনা করা হত।

"পূর্বোক্ত আশাবাদী তত্ত্ব-দর্শন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক জায়গাতেই সমাজবাদীদের এর পরিণামের সম্মুখীন হতে

হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ সমূহে মার্কসবাদকে তার যুক্তিসিদ্ধ পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং তার পরিণামে মোটেই মার্কসের বিশ্বাস সাকার হয়ে 'স্বাধীন ও সমানাধিকার ভোগকারীদের সমাজ' স্থাপিত হয় নি, বরং এর ফল হয়েছে একনায়কত্ববাদী স্বৈরতন্ত্র। এ ছাড়া, রাষ্ট্রের হাতে যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা থাকার দরুন কার্যতঃ এর উপর কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। শ্রমিকদের পক্ষে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে রাষ্ট্রের করুণাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকা আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ পুঁজিপতিরা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মত অন্ততঃ সর্বব্যাপী নয়। তাই পুঁজিবাদ যদি ব্যক্তিবাদ চালিত উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, তা হলে সাম্যবাদ হচ্ছে যৌথবাদ পরিচালিত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রোগের প্রতিবিধান ব্যাধির চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়ঃ নয়।

"গণতান্ত্রিক দেশ সমূহ এবং বিশেষতঃ যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের যৌথ মালিকানাভিমুখী অগ্রগতি ও সরকারী মালিকানাভুক্ত (publicly owned) শিল্প-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রচলিত পদ্ধতি কতটা কার্যকুশল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। মালিকানার পরিবর্তন হওয়াই কোন শিল্প-ব্যবসায়কে সমাজবাদী পদ্ধতিতে সঞ্চালন করার পক্ষে যথেষ্ট—এ বিশ্বাস আর বজায় নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায়কে 'জনস্বার্থে' পরিচালিত করতেই হবে—পার্লামেণ্ট এই মর্মে ঘোষণা জারি করতে পারে এবং এর অর্থ কী তাও না হয় পার্লামেণ্ট ব্যাখ্যা করল। কিন্তু পার্লামেণ্ট তো তৎকর্তৃক সৃষ্ট বিশালায়তন শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের আভ্যন্তরীণ কর্ম-ব্যবস্থা কার্যকারী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। আর তা ছাড়া মাঝে মাঝে এ দাবিও ওঠে যে, পার্লামেণ্টের হাতে এ রকম অধিকার থাকাও উচিত নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায় অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক সঙ্ঘের সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি কর্মচারী পূর্বেরই মত এ কথা ভুলতে পারে

না যে, তার কর্মজীবনের অধিকাংশ পরিস্থিতির উপর কার্যতঃ তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। নাগরিক বা শ্রমিক-সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে তার যে ভোটের অধিকার আছে, তার কিছুটা মূল্য রয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা যে ফল লাভ হবে বলে একদা আশা করা গিয়েছিল, তা স্পষ্টতঃ পূর্ণ হচ্ছে না। বর্তমান স্বরূপে সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তৃত করার ব্যাপারে উৎসাহের অভাব এই অসন্তোষের বাহ্য নিদর্শন।

"বৈপ্লবিক বা গণতান্ত্রিক যে-সব তত্ত্ব-দর্শন ঘোষণা করত যে, সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাই নববিধানের সিংহ-দ্বার, আজ সে সব আর কারও মনে আস্থা জাগাতে পারছে না।

"...নিঃসন্দেহেই ব্যক্তিগত মালিকানারূপী মুদ্রার একটি দিক হচ্ছে ক্ষমতা এবং এর অসদুপযোগ হতে পারে। তবে অন্য দিক থেকে মুদ্রাটিকে দেখলে বোঝা যাবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা মানব-স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনুকূল ভূমি।

"...একবার রাষ্ট্রের হাতে পুঁজির যাবতীয় উৎস চলে গেলে রাষ্ট্র ছাড়া আর কারও তার বিনিয়োগ ও বিলি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে না। প্রত্যেকটি ব্যবসা ও বাণিজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন হয়। রাষ্ট্রানুমোদিত না হলে অপর কোন পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা থাকে না। নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াবার ঝুঁকি যে নেবে বা ওই রকম দুঃসাহস প্রকাশ করবে, সমাজে তার কোন স্থান নেই অথবা তার পরিণতি আরও ভয়াবহ। ব্যক্তিগত পুঁজির পরিপূর্ণ বিলোপের অর্থই হচ্ছে একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করা।

"দ্বিতীয় ভ্রান্তির মূলে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, মালিকানা কেবল ব্যক্তিগত হলেই তা ক্ষতিকারক। তদনুযায়ী মনে করা হত যে, একবার মালিকানা সরকারের হাতে গেলে এই ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত স্বল্পহানিকর হবে। কারণ সমাজ তখন সামাজিক হিতের লক্ষ্যচালিত হয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করবে। অভিজ্ঞতার ফলে এখন দেখা গেছে যে,

মালিকানার ক্ষমতা সরকারের হাতে গেলেও তা বিপদের কারণ হতে পারে। সে অবস্থাতেও এর দুরুপযোগের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং তার ফলে ব্যক্তি মানবকে তার স্বাধিকার রক্ষার জন্য তখনও সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং বেসরকারী বা সরকারী—যে কোন রকমের মালিকানার ক্ষমতাই হোক, এর নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত পন্থা আবিষ্কার করতে হবে।”

আর্থিক ক্ষমতার স্বভাব-ধর্ম

আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষমতার স্বভাব-ধর্ম কী? এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে, অর্থাৎ যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তার স্বরূপ ও রণকৌশল জানা না থাকলে, তাকে পর্যুদস্ত করা অবাস্তব কল্পনা। এ সম্পর্কে ‘টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী সোশালিজমের’ সুচিন্তিত অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বইটির মতে, “আজকের দিনে আর্থিক ক্ষমতার প্রধান সমাহার দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন বাজারে যারা নানা রকম পণ্য ও কর্মের (services) জোগান ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ক্ষমতার কথা বিচার করা যেতে পারে। এই সব বাজারে কেনা-বেচা, ধার দেওয়া ও নেওয়া, ভাড়া নেওয়া এবং ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি হয়ে থাকে। একে বাজারের ক্ষমতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সব বাজারের ক্ষমতার অধিকারীরা কদাচিৎ নিজেরা নিজেদের আওতাভুক্ত সম্পদের মালিক (owner)। এঁরা হচ্ছেন বিরাট্ বিরাট্ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালকবর্গ এবং এঁদের নির্দেশেই ওই সব প্রতিষ্ঠানের বাজার সংক্রান্ত কার্যকলাপ চালিত হয়। এরা হচ্ছে ব্যাঙ্ক, স্বয়ং কোন অর্থের মালিক না হয়েও যারা কারেন্সি ও ব্যাঙ্ক-ক্রেডিটের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এরা হচ্ছে বীমা কোম্পানী এবং বিল্ডিং সোসাইটি; যাদের নিজেদের টাকা পয়সা বিশেষ কিছু না থাকলেও লক্ষ লক্ষ লোকের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে কাজ-কারবার করে এবং এই সব আমানতকারীদের অনেকেরই পূর্বে কিছু জমাবার মত সঙ্গতি ছিল

না। এরা হচ্ছে কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ সব কিছুর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকারী ট্রেড এসোসিয়েশন এবং মার্কেটিং বোর্ড। শ্রমিকরাও তাদের বেশ ভাল রকম বাজার-ক্ষমতা সৃষ্টি করে নিয়েছে। তাদের শ্রমিক সঙ্ঘের শ্রম-শক্তি সরবরাহ করার ক্ষমতা আছে এবং তাদের সমবায় সমিতিগুলির হাতে লক্ষ লক্ষ সদস্যের ক্রয়-শক্তি রয়েছে। আর সর্বোপরি রয়েছে রাষ্ট্র। প্রায় প্রতিটি বাজারে রাষ্ট্র ক্রিয়াশীল থাকায় সর্ব প্রকারের রসদ ও সম্পদের জোগান এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের হাতে বর্তিয়েছে।

"দ্বিতীয় ধরনের ক্ষমতা রয়েছে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরই। এগুলির আকার বৃহত্তর হয়েছে, এদের কার্যপরিচালনা-পদ্ধতি অধিকতর জটিল হয়েছে। এই সব ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আজকাল তাদের ক্রমবর্ধমান পুঁজি সংগ্রহ করে বিভিন্ন রকমের অংশীদারদের কাছ থেকে এবং তাই এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারদের উপর নির্ভর করতেই হয়। প্রতিষ্ঠান সরকারী বা বে-সরকারী যাই হোক না কেন, তার পরিচালক এই সব ম্যানেজাররা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের উপর ম্যানেজার-সুলভ (managerial) ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এদের মালিকবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করলেও তারা যেখান থেকে ক্ষমতা আহরণ করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ইমারৎ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তির সাকুল্য মুল্য পরিমাপের চেয়েও বেশী। এই-জাতীয় প্রতিটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানই এক একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ; এদের কর্তৃত্ব-ব্যবস্থার একটি কাঠামো আছে, পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা-সম্পদ্ এবং শুভেচ্ছার পুঁজি এদের পিছনে রয়েছে। ম্যানেজারের ক্ষমতা এই সব কারণের উপর অধিষ্ঠিত। কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সরকারের হাতে গেলে মালিকানার ক্ষেত্রে হয়তো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়। কিন্তু এর কার্য পরিচালনার দিক এর পরও সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে, এমন কি মালিকানা

হস্তান্তরের পর পূর্বের ব্যক্তিবর্গ ম্যানেজার-সুলভ ক্ষমতা-দণ্ড প্রয়োগে নিরত থাকতে পারে।" জিলাসের 'নিউ ক্লাস' গ্রন্থ এরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দলিল। এমন কি রাজনীতির সম্পর্ক-বিরহিত এরিখ ফ্রোমের মত সমাজবিজ্ঞানীরাও বৃহদায়তন শিল্প ও ব্যবসায়ের এই চারিত্রধর্মের কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প-আধারিত উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেমস বার্নহাম তাঁর 'দি ম্যানেজেরিয়াল রিভলুশান' পুস্তকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ক্রমশঃ তা উৎকটভাবে সত্যে পরিণত হবার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এক বৈপ্লবিক সমাধান

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার পথে কেবল রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যথেষ্ট তো নয়ই, এমন কি এর দ্বারা সমস্যার এক ক্ষুদ্র-ভগ্নাংশেরও সমাধান হয় না। বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রকে তাই এর চেয়েও কোন শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকুশল পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। এইখানে গান্ধীজী-কথিত কুটীর-শিল্প বা বিকেন্দ্রিত উৎপাদন-পদ্ধতির সার্থকতা। গান্ধীজীর মতে মানুষের নিত্যব্যবহার্য পণ্যসম্ভার যথাসম্ভব স্বাবলম্বী ও বিকেন্দ্রিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ মানুষের জীবন-কাঠি যেন কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থার কবলিত না হয়। কারণ তা হলে যারা এই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঞ্চালন করবে, তারাই প্রত্যেত প্রতিটি মানুষের অন্নদাতা হয়ে ওঠার জন্য তাদের সর্বময় প্রভু হয়ে যাবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ অন্যায় করলে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে, তার জন্য জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। মানুষের ভিতর এই ভাবে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা না থাকলে "স্বাধীনতা ও সাম্য-আধারিত সমাজের" আশা সুদূরপরাহত। গান্ধীজী সেই জন্য স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমি এই সত্য সপ্রমাণ করার প্রয়াস করছি যে, মুষ্টিমেয় কয়েক জন ক্ষমতা অধিকার করলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয় না, পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষের

দুষ্প্রয়োগ হলে সকলের ভিতর যদি তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে, তা হলে তার নাম হচ্ছে স্বরাজ। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন করার উপযুক্ত যোগ্যতা জনগণের ভিতর সৃষ্টি করার শিক্ষা তাদের দেওয়ার মারফতই স্বরাজ অর্জন করতে হবে।" (২৯-১-১৯২৫)

অতএব শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকামাকে দৈনন্দিন চাহিদা বা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসগৃহের জন্য কোন কেন্দ্রিত শক্তি বা দূরস্থিত ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হলে চলবে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামীণ বা আঞ্চলিক স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে এই সব চাহিদার পরিপূর্তি করতে হবে। সুতরাং খদ্দর চরখা ঢেঁকি ঘানী ইত্যাদি যে বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত মধ্যযুগীয় পরিকল্পনা নয়, বরং এ এক সমাজ-বিপ্লব-সংসাধনকারী কর্মপন্থা—এ কথা এবার স্পষ্ট হবে।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ বিকেন্দ্রিত উপায়ে উৎপন্ন হলে দেশে ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এই ভাবে এই ক্ষেত্রে শাসনের প্রয়োজনও অনেকাংশে অবলুপ্ত হবে। আর ইতঃপূর্বে উৎপাদক ও উপভোক্তাকে যে ভাবে দূরস্থিত বাজার ও মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণীর ব্যক্তিদের (middle men) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছিল, তার আবশ্যকতাও থাকবে না। এর ফলে পরিবহণ-ব্যবস্থার আবশ্যকতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং চট টিন কার্ডবোর্ড ইত্যাদি প্যাক করার উপাদান বা জাতীয় সম্পদ্ অপচয়কারী 'অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তার' প্রয়োজন কমে যাবে।

অপরিহার্য কেন্দ্রিত উৎপাদন

এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু না কিছু কেন্দ্রীয় শ্রমশিল্পের অস্তিত্ব অপরিহার্য-রূপে থেকে যাবে। প্রকৃতি কোন কোন শিল্পকে কেন্দ্রিত করেছে। লোহা তামা ম্যাঙ্গানিজ কয়লা ইত্যাদি খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন এই শ্রেণীতে পড়ে। তারপর কোদাল কুড়াল ইত্যাদি বিকেন্দ্রিত উপায়ে

উৎপাদন করলেও, লোহা তামা ইত্যাদি গলানো বা সিমেণ্ট, ইস্পাত ইত্যাদির উৎপাদন লাভজনক ভাবে বিকেন্দ্রিত পদ্ধতিতে উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এ সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থার শরণ নিতে হবে। এ ছাড়া, রেল মোটর বিমান ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ডাক ও তার ব্যবস্থাও চালাতে হবে। কুটীর-শিল্পের উপযোগী ছোট ছোট যন্ত্রপাতির জন্যও কেন্দ্রিত যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা চাই।

শাসন-নিরপেক্ষ সমাজের আদর্শে উপনীত হবার লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন ওঠে যে, এই সব অপরিহার্য কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা পবিচালনার উপায় কী? এর জন্য নিম্ন-বর্ণিত কয়েকটি পদ্ধতির শরণ নেওয়া যেতে পারে।

যুগোশ্লাভিয়ার ওয়ার্কার্স কাউন্সিল

(ক) যুগোশ্লাভিয়ার অনুরূপ পদ্ধতিতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির নেতৃত্বে গঠিত শ্রমিক পরিষদ বা ওয়ার্কার্স কাউন্সিল এ সবের দায়িত্ব নিতে পারে। ১৯৫১ সনের পর থেকে যুগোশ্লাভিয়াতে এই যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, এ বেশ সুফল প্রসব করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ওয়ার্কার্স কাউন্সিল বিকেন্দ্রিত ভাবে বৃহদায়তন শ্রমশিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করার এক নবীন পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল কর সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফত কারেন্সি বাজারে ছাড়া ও শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য সাধারণ কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই শ্রমিক পরিষদ সরকারী কর্তৃত্বের প্রভাবমুক্ত এক স্বতন্ত্র একম্ রূপে কাজ করে। প্রত্যেকটি শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খোলা বাজারে অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং বাজারই পণ্যমূল্য ও লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করে। মেরামত, ক্ষয় ক্ষতি, দান এবং কার্য সম্প্রসারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বাকী লাভ কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই-জাতীয় শ্রমিক পরিষদ গঠিত হবার পর শ্রমিকদের

কর্মদক্ষতা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পেয়ে থাকে। যুগোশ্লাভিয়াতে পরিষদ গঠিত হবার পর সর্বপ্রথম তারা অপ্রয়োজনীয় শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করে দেয়। কারণ তাদের আয় নিষ্কর্মা শ্রমিকদের ("featherbed employees") জন্য অহেতুক কম হয়ে যাবে—এটা শ্রমিকদের কাম্য হতে পারে না। বিক্রয়-ভাণ্ডারগুলিতে এই শ্রমিক পরিষদের প্রথা শ্লথগতি পণ্য বিক্রয়কে রাতারাতি প্রচণ্ড রকমে গতিশীল করে তুলল। কারণ এবার এখানকার ব্যবসা-পত্র আর সরকারের নয়, এ সব কর্মচারীদের নিজেদেরই। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য হয় নি। কিন্তু কর্মচারীরা ভাবলেন যে, তাঁদের দোকানের বিক্রি বেশী হলে নিজেদের উপার্জনও বেড়ে যাবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণতঃ দুই-তিন বৎসর) এই পরিষদের নির্বাচন হয়। যে কোন কারখানা ইচ্ছা করলে অপর কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই বাজার তেজী না হওয়া পর্যন্ত মাল মজুদ করে রেখে দিতে পারে, তারা বিশেষ এক পণ্যের পরিবর্তে অপর যে কোন পণ্য উৎপাদন করতে পারে, কাঁচা মাল কেনার বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যমূল্য বাড়াতে পারে, দাম কমিয়ে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে পারে। অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়ার এই নবীন পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ রহিত স্বাধীন শিল্প-ব্যবসায় আখ্যা দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রতিষ্ঠা করা এই সব শ্রমিক-পরিষদের অন্তিম লক্ষ্য। তাই এই-জাতীয় কয়েকটি পরিষদ সম্মিলিত হয়ে স্থানীয় কমিউনের নির্বাচন করে। এই সব স্থানীয় কমিউন আবার সম্মিলিত ভাবে জেলা কমিউনের নির্বাচন করে এবং এইভাবে দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান পিপলস কমিটি বা কমিউনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠান একাধারে পার্লামেণ্ট এবং সরকার। যুগোশ্লাভিয়ার সমাজবাদী তত্ত্ববেত্তাদের মতে এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান অবশেষে বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে "রাষ্ট্রের আত্ম-অবলুপ্তির" আদর্শকে মূর্ত করবে।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে যুগোশ্লাভিয়াতে অনেক প্রগতিশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য চলছে। কিন্তু ওই দেশের রাজনৈতিক দলের চারিত্র-ধর্মে পরিবর্তন সাধন না করলে এবং সর্বোপরি মার্কসীয় তত্ত্ব-দর্শনের ভিত্তিভূমি বর্জন না করলে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ও মানুষকে কেবল আর্থিক প্রবর্তনা বিশিষ্ট জড়বস্তু-খণ্ড বলে বিশ্বাস করার অভ্যাস পরিহার না করলে, কেবল আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই-জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রয়োগ বাঞ্ছিত সুফল প্রসব করতে পারবে না। যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম নায়ক এবং একদা টিটোর দক্ষিণহস্ত ও বিশিষ্ট সমাজবাদী চিন্তানায়ক রূপে পরিচিত মিলোভান জিলাস তাঁর সুবিখ্যাত 'নিউ ক্লাস' নামক গ্রন্থে যে সব প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, তার জবাব যুগোশ্লাভিয়াতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় নিরত বর্তমান শাসক দলকে কোন না কোন দিন দিতেই হবে। ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেণ্টকে বর্তমান যুগোশ্লাভিয়ার সরকার দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে বা তাঁকে নজরবন্দী করে তাঁর বক্তব্যের যথার্থতাকে নস্যাৎ করতে পারবে না। অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত বিগত বিশ্ব সমাজবাদী সম্মেলনে আচার্য কৃপালনী মার্কসবাদ সম্বন্ধে এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সুখের কথা যে, দুনিয়ার অনেক সমাজবাদী নেতা তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেন।

গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

(খ) উৎপাদন বণ্টনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (strategic point) সমাজ সুপরিকল্পিত উপায়ে অংশ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীকে উৎপাদন বা বণ্টনের বিশেষ এক ক্ষেত্রে অপ্রতিহত ও একচেটিয়া অধিকার বা ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এই কার্যে নিযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্রেতা বা উপভোক্তাদের সমবায় সমিতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; রাষ্ট্র যে সর্বাবস্থায় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জরুরী পণ্যের মূল্য নিয়ে ফাটকাবাজী এবং ভোগ্য

পণ্য সরবরাহের মারফত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার লাভ ইত্যাদি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। কোন শিল্প-ব্যবসায়ে অকস্মাৎ মন্দা দেখা দিলে এই প্রতিষ্ঠান ক্রেতা ও মজুদকারী রূপে বাজারে অবতীর্ণ হয়ে সেই ব্যবসায়কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অনুরূপভাবে উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করে উপভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও ওই-জাতীয় প্রতিষ্ঠান সহায়ক হতে পারে। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে সুসংগঠিত শ্রমিকদের দাবি আদায় করার ক্ষমতার (bargaining power) প্রবল প্রভাপান্বিত দণ্ড কেবল নিয়োগকর্তার উপরই পড়ে না, সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপভোক্তাদেরও এর চাপ বহুলাংশে সহ্য করতে হয়। তাই যে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর (সে যদি শ্রমিক শ্রেণীও হয়) একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকারের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাবার জন্য এই সব গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের (checks) ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশ সমূহে এই ভাবে সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া গেছে।

শিক্ষার মাধ্যম

(গ) এই-জাতীয় অপরিহার্য কেন্দ্রিত শ্রম শিল্প সমূহকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। অখিল ভারত সর্ব সেবা সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এই প্রস্তাব চিন্তাশীল সমাজ কর্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত হবার যোগ্যতা রাখে। তাঁর মতে সর্বোদয় সমাজে তিন ধরনের শিল্প-ব্যবস্থা থাকবে—কুটির-শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প। এখানে স্মরণীয় যে, শিল্প ব্যবস্থার এই বিভাজন তার আয়তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। কুটির-শিল্পের কর্ম প্রক্রিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে। গ্রামীণ শিল্প ও রাষ্ট্রীয় শিল্প হবে যথাক্রমে উত্তর-বুনিয়াদী ও উত্তম-বুনিয়াদী অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মাধ্যম। এই ভাবে জামসেদপুর বা রাউরকেলার ইস্পাত কারখানা ধাতু-বিজ্ঞান

এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবে। তখন সেখানে আর মালিক-মজুর বা সুপারিনটেনডেণ্ট ও ফোরম্যান বনাম অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যা থাকবে না। প্রত্যক্ষ উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিক এই ব্যবস্থায় ধাতু-বিজ্ঞান বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবে ও সুপারিনটেনডেণ্ট ও ফোরম্যানের স্থান নেবেন শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা।

কেবল উৎপাদন-ব্যবস্থাই নয়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মজুমদারের মতে স্বাবলম্বী স্বয়ং-শাসিত সমাজে উৎপাদন ব্যতিরেকে অপর দুটি কৃত্য— অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থার সঞ্চালন ও প্রাকৃতিক সাধন সমূহের অনুসন্ধানও শিক্ষার মাধ্যমে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক উত্তর-দায়িত্ব

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু না কিছু ব্যবস্থাপক কর্মের (managerial functions) প্রয়োজনীয়তা সমাজে থাকবে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজবাদীরা যাকে সামাজিক উত্তর-দায়িত্ব (social accountability) এবং গান্ধীজী যাকে ন্যাসবাদ বলতেন, তার শরণ নিতে হবে। শিক্ষা দ্বারা সমাজে এই নব মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, কেবল ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদই নয়, মানুষের শারীরিক শক্তি ও মানসিক ক্ষমতাও সমাজের, এবং এর সম্যক্ বিনিয়োগ সমাজ-হিতার্থে করে সমাজের কাছ থেকে নিজের জন্য যেটুকু না হলে নয়, তার চেয়ে বেশী নেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ আমরা শ্রম করব সাধ্যানুযায়ী, কিন্তু এর বিনিময়ে ভৌতিক প্রতিদান নেব প্রয়োজনানুযায়ী। বিনোবাজী কর্তৃক প্রারব্ধ ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন এই আদর্শাভিমুখী এক মহান্ পদক্ষেপ। নিঃসন্দেহেই তাঁর "সমাজায় ইদম্, ন মম" মন্ত্র ভারত তথা বিশ্বে এক নবযুগের অভ্যুদয় ঘোষণা করছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদীদের একটি পুরাতন আশঙ্কার কথাও মনে রাখতে হবে। 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী সোশালিজমের' ভাষায়, "যাঁরা কেবল হৃদয় পরিবর্তন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রচারের

দ্বারা সংস্কার সাধন করার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করেন, সমাজবাদীদের তাঁদের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার সংগত কারণ আছে। সমাজবাদীরা সর্বদাই এর সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপরও জোর দিয়ে এসেছেন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সাংগঠনিক দিক্ হচ্ছে সামাজিক উত্তর-দায়িত্ব। এর সার্থক রূপায়ণের তিনটি শর্ত আছে। প্রথমতঃ, যাঁরা ক্ষমতার প্রয়োগ করেন, তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তাদের কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এই সামাজিক উত্তর দায়িত্বের পিছনে একটা শক্তি (sanction) থাকা চাই ; শেষ পর্যন্ত এমন কোন উপায় থাকা দরকার, যাতে কেউ এই কর্তব্যচ্যুত হলে তাকে সংযত করে সংশোধন করা যায়। তৃতীয়তঃ, ক্ষমতাধীশদের কী করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত হওয়া দরকার। তাঁদের আচরণের সুস্পষ্ট মান নির্ধারণ করতে হবে। এই মান পূর্ব থেকে স্থির না থাকলে তাঁরা এ সব মেনে চলবেন—এ আশা করা চলে না।”

রাজনৈতিক দিক

আর্থিক কারণের কথা আলোচনা করা হল। এবার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কারণের জন্য সমাজ-ব্যবস্থার যে কেন্দ্রীকরণ হয়, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়ের সন্ধান করতে হবে। এ সম্বন্ধে সি· ই. এম· জোডের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। গণতন্ত্র কেন বাঞ্ছনীয় তার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি এক স্থলে বলেছেন, “দায়িত্বহীন ক্ষমতা ক্ষমতা-প্রয়োগকারীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে এবং এই শ্রেণীর মানুষ এর অসদুপযোগ করে বলেই শুধু আমরা কাউকে অসীম ক্ষমতা দেবার বিপক্ষে নই। ক্ষমতা-প্রয়োগকারীরা তাঁদের দ্বারা প্রযুক্ত ক্ষমতার পরিণাম স্বয়ং ভোগ করেন না বলেও আমরা কাউকে দায়িত্বহীন অসীম ক্ষমতা দেবার বিরোধী। অর্থাৎ তাঁরা যে আইন তৈরী করেন, নিজেদের তার আওতায় থাকতে হয় না। তা হলে কথা

দাঁড়াচ্ছে এই, আইন তৈরী করার অধিকার তাঁদেরই থাকবে, যাঁদের সে আইন মেনে চলতে হবে।”

এই নীতির ব্যাপকতম প্রয়োগ ও চূড়ান্ত গণতন্ত্রের অপর নাম হচ্ছে বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা। পূর্বোক্ত বাক্যটিতে “সমাজ-ব্যবস্থা” শব্দটি সজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়েছে; কারণ ওই স্থিতিতে কেবল স্বয়ং-আরোপিত ব্যবস্থাই থাকবে, শাসনের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই মানব-গোষ্ঠীর সংহতি বিধানকারী ওই একম্ (unit) রাষ্ট্রের বদলে হবে সমাজ। অতএব শাসন-নিরপেক্ষ সমাজের আদর্শে পৌঁছাতে হলে প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধন করতে হবে। গান্ধীজীর কথায়, “অসংখ্য গ্রাম দ্বারা গঠিত এই কাঠামো নিয়ত পরিবর্ধনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্র হবে প্রতিটি ব্যক্তি। এই সব ব্যক্তি গ্রামের জন্য এবং এই গ্রামগুলি গ্রামগোষ্ঠীর জন্য আত্মত্যাগে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তি-সমষ্টি দ্বারা গঠিত এই কাঠামো এই-ভাবে শেষ অবধি একটি মাত্র সত্তায় পরিণত হবে। উদ্ধত হয়ে এরা কখনও অপরের উপর চড়াও হবে না, বরং মহাসাগর রূপ গ্রামগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় সর্বদাই তারা হবে বিনয়ী।...সুতরাং সর্ববহিঃস্থ বেষ্টনী-রেখা, আভ্যন্তরীণ বেষ্টনীকে চূর্ণ করার জন্য তার শক্তি প্রয়োগ করবে না, বরং ভিতরের মণ্ডলীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং নিজ কেন্দ্র থেকে শক্তি পাবে।” অর্থাৎ শাসন-নিরপেক্ষ সমাজের পথে চলার জন্য আমাদের গ্রাম-স্বরাজ বা পঞ্চায়েত-রাজ স্থাপন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় শাসন ও বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে গ্রাম সমিতির উপর। গ্রাম সমিতি যেটুকু অধিকার সঞ্চালন করতে পারবে না, বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমিতি সমূহের সঙ্গে যেখানে সাধারণ স্বার্থের সংস্রব থাকবে, সেখানে মাত্র ততটুকু ক্ষমতা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হবে। এইভাবে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত থেকে একই সূত্র অনুসারে ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে সর্ব-ভারতীয় পঞ্চায়েত

গঠিত হবে এবং তার হাতে মাত্র দেশরক্ষা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, পরিবহণ এবং সংযোগ রক্ষা ইত্যাদি সীমিত ক্ষমতা থাকবে।

'এই প্রসঙ্গে বর্তমানে সরকার যে সব পঞ্চায়েত গড়ছেন তার সঙ্গে প্রস্তাবিত পঞ্চায়েতের মৌলিক পার্থক্য কোথায়—তা জেনে রাখা প্রয়োজন। সরকারী পঞ্চায়েত প্রথায় প্রাদেশিক সরকারের আইন দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং সরকার যে কোন সময় ইচ্ছা করলে গ্রাম-পঞ্চায়েতকে প্রদত্ত স্বল্প পরিমাণ ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু উপরে যে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তাতে গ্রাম-পঞ্চায়েত সার্বভৌম এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত যেটুকু আবশ্যকতা বোধ করবে, ততটুকু ক্ষমতা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতকে দেবে। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-পঞ্চায়েতকে রদ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকবে না। এ ছাড়া সর্বোদয়ের আদর্শ পঞ্চায়েত আর্থিক দিক থেকেও যথাসম্ভব স্বাবলম্বী এবং বর্তমানের সরকারী পঞ্চায়েতে এর কোন অবকাশ নেই বললেই চলে। সুতরাং উভয়বিধ ব্যবস্থার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান, তা এবার স্পষ্ট হবে। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বোদয় কোন জাতীয় আদর্শ নয়, এর আবেদন সার্বত্রিক। অর্থাৎ শাসনমুক্ত সমাজের পূর্ণ রূপায়ণ বিচ্ছিন্নভাবে একটি দেশে হবে না। শাসনমুক্ত সমাজে বর্তমানের কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সীমারেখার ভেদাভেদ মিটে যাবে এবং অবশেষে সমগ্র বিশ্ব এক পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত হবে।

কঃ পন্থাঃ ?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ আদর্শে উপনীত হবার উপায় কী? ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনের মারফত গান্ধী-শিষ্য বিনোবাজী এর এক বাস্তব পন্থার দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। ভূদান-যজ্ঞের সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে গ্রামদান। গ্রামস্থ সকলে (নূতন পরিভাষা অনুযায়ী শতকরা অন্ততঃ ৮০টি পরিবারের মোট জমির অন্ততঃ অর্ধেকেরও বেশী নিয়ে) তাদের ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দিয়ে সচেতনভাবে এক

সাধারণ স্বার্থ (common interest) গড়ে তোলে। তারপর শ্রমশক্তি এবং বুদ্ধিশক্তিরও গ্রামীকরণ হয়। সম্পদের গ্রামীকরণ হবার পর পারিবারিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে কৃষি করার জন্য গ্রামের ভূমির পুনর্বণ্টন হয়। অতঃপর গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা সর্বানুমতিক্রমে একটি গ্রাম সমিতির নির্বাচন হয়। এই সমিতি গ্রামের প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয়। গ্রামের জনহিতকর কার্যাবলীর পরিকল্পনা রচিত হয় ও তার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, শস্য বা শ্রমশক্তিও এই গ্রাম সমিতি দ্বারা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়। গ্রামকে নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যোপকরণের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরী করে গ্রাম সমিতি তাকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে কার্যান্বিত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

গ্রামদান ছাড়াও কোথাও কোথাও গ্রামসংকল্পের মাধ্যমে এই-ভাবে অগ্রসর হবার প্রয়াস করা হচ্ছে। অন্ন, বস্ত্র বা এই জাতীয় এক বা একাধিক নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যোপকরণের বিষয়ে প্রথমে গ্রাম স্বাবলম্বী হবার সংকল্প নেয়। অর্থাৎ এই ভাবে এর দ্বারা এক সাধারণ স্বার্থ গড়ে তোলা হয়। তারপর এই লক্ষ্যের পরিপূর্তির জন্য কাজ করতে করতে গ্রামে এক গণতান্ত্রিক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই নব-গঠিত গ্রামসভার ভিতর গ্রামের সকলের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব-বোধ জাগানো হয় এবং তার পর সকলকে কাজ ও খাদ্য দেবার দায়িত্ব স্বভাবতঃই গ্রামসভা নিজের উপর নিয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামসভা স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, ভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় এবং তাই তারা গ্রামদান ও তার পরবর্তী ধাপ গ্রামস্বরাজের প্রতি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়।

গ্রামদানের পর সত্তাদান

তবে এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামদান একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার সূত্রপাত মাত্র। আদর্শ স্থিতিতে

উপনীত হবার জন্য গ্রামদানের পর বহু কিছু করণীয় আছে এবং গ্রামদান তার প্রথম ধাপ। তেমনি আবার গ্রামদানের মত কোন কিছু না হলে, অর্থাৎ এই সাধারণ স্বার্থ সৃষ্টি না হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামস্বরাজ স্থাপনার পথে এগোনোও যাবে না। গ্রামদানী গ্রামে একটি বিষয়ের প্রতি খরদৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষতঃ কমিউনিটি প্রজেক্টরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্ঘশক্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনের বন্ধন একে একে ছিন্ন করতে হবে। অর্থাৎ গ্রামে চরখা ও তাঁত দ্বারা বস্ত্র উৎপাদন করে নেবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, মিলের কাপড় সেই গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গ্রামবাসী গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সেচ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে নিলে, এই বাবদ সরকারকে প্রদেয় কর দেওয়াও বন্ধ করে দিতে হবে। গ্রামের শান্তি-সেনা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার উপযুক্ত হয়ে গেলে পুলিশ খাতে প্রদত্ত করও বন্ধ করে দিতে হবে। এইভাবে গ্রামদানের পর সরকারের কাছে সত্তা বা ক্ষমতা দানের কথা বলার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। গ্রামদানের কর্মীদের সামনে শাসনবিহীন সমাজ গঠন করার এই অন্তিম লক্ষ্য সদাজাগরূক না থাকলে এবং তদনুযায়ী ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করলে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা নেওয়ার পরিণামে এই বৈপ্লবিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকারের বহুবিধ লোককল্যাণ কার্যের একটিতে পর্যবসিত হতে পারে। অর্থাৎ এর দ্বারা জনকল্যাণ হলেও শোষণের মূলোচ্ছেদ—শাসনের অবসানের আদর্শ সংসাধিত হবে না।

কারখানা ও ব্যবসায় দান

গ্রামীণ ক্ষেত্রের জন্য গ্রামদান এক আদর্শ কর্মসূচী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শহরের জন্যও অনুরূপ কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। ভূদানের কর্মীরা সংখ্যাল্পতা ও অন্য নানাবিধ কারণে এ যাবত শহর ও

কারখানার ক্ষেত্রে স্বীয় আদর্শানুযায়ী উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করে উঠতে পারেন নি। ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনকে সর্বব্যাপক হতে হলে এ দিকটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। গ্রামদান দ্বারা যেমন গ্রামীণ ক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দিয়ে শাসনবিহীন সমাজ গঠনের জন্য এক সাধারণ স্বার্থ গড়ে তোলা হয়, তেমনি শহরাঞ্চলেও কারখানা বা মহল্লা দানের দ্বারা অগ্রসর হতে হবে। কারখানা দান হবার পর সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে সর্বানুমতিক্রমে ও প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে ওই কারখানা বা শহরের অংশ বিশেষের কাজকর্ম পরিচালন দ্বারা এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। ভূদান বা গ্রামদানের মত এই দিকে এ যাবত প্রত্যক্ষ কোন রকম অগ্রগতি না হবার জন্য বর্তমানে এর প্রতি ইশারা করা ছাড়া বিস্তৃতভাবে কোন রকম কার্যক্রম ছকে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইংলণ্ডের স্কট-বার্ডার এণ্ড কমনওয়েলথ, রবার্টস ওয়েস্টার্ন কোম্পানী, জন লুই পার্টনারশিপ ইত্যাদি কোম্পানী এবং সম্প্রতি জার্মানীর হামবুর্গের ড. কুর্ট কোরবারের সিগারেট উৎপাদনের মেশিন তৈরীর কারখানা এইভাবে দান করার পর যেভাবে সেখানকার কাজকর্ম চলছে, তার থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। কারখানা বা ব্যবসা দান ভারতে নূতন শোনালেও ইংলণ্ড বা জার্মানী, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে এতদভিমুখে বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া গেছে। শহরাঞ্চলে এইভাবে ন্যাসবাদের বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং রামকৃষ্ণ পাতিল প্রমুখ সর্বোদয় বিচারধারার পুরোধাবর্গের অভিমত বিশেষভাবে বিবেচ্য।

রাষ্ট্রশক্তি নয়, জনশক্তি

এ যুগে আর একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন বলে মনে হচ্ছে না। রাষ্ট্র ক্রমশঃ সমাজের অধিকারের ক্ষেত্র সংকুচিত করছে। যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা আর নেই। ফলে সমাজের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, সমাজের সদস্যদের

পারস্পরিক ব্যক্তিগত পরিচয় বা সম্বন্ধ নেই বললেই চলে এবং তাই রাষ্ট্র এখন সমাজের কর্তব্য অনেকাংশে হাতে তুলে নিয়েছে ও ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় সমাজের অধিকার খর্ব করার দিকে এগোচ্ছে। বিকেন্দ্রিত উৎপাদন, বণ্টন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই বিপদের হাত অনেকখানি এড়ানো যাবে। এ ছাড়া, শাসন-নিরপেক্ষ সমাজ রচনা-কামীকেও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

ভূদান গ্রামদান আন্দোলন এই দিক থেকেও তাই প্রশংসার্হ। মূলতঃ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রারব্ধ এই আন্দোলন তার আদর্শ রূপায়ণের নেতৃত্ব আইন অর্থাৎ দণ্ডশক্তির হাতে দেওয়া অনুচিত বোধ করে। কারণ আর্থিক ও সামাজিক অসাম্য যদি রাষ্ট্রশক্তির বাইরে থেকে জনশক্তির বলে দূর করা না যায়, তা হলে শাসন-নিরপেক্ষ সমাজ রচনার কথা বলা অবাস্তব উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আইনের সীমাবদ্ধতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জাগ্রত জনমতের সচেতন সমর্থন না পেলে আইনের দশা কী হয় তা আমাদের দেশের "বিধবা বিবাহ আইন", "সরদা আইন", "অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন" প্রভৃতি আইনের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। এ সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অভিজ্ঞতাও শিক্ষাপ্রদ। 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী সোশালিজম'-এর মতে, "যে কোন কার্যপ্রণালী বা আচরণবিধি স্বীকৃত হোক না কেন, কোন আইনই জনসাধারণকে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে না—আর আইনের যথার্থ অভিপ্রায় অনুযায়ী চলা তো আরও দূরের কথা।" সেইজন্য সমাজের বিবিধ সমস্যা যথাসম্ভব রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে জনশক্তির দ্বারা সমাধান করে রাষ্ট্রের অধিকার ও প্রয়োজনকে সামাজিক ক্ষেত্র থেকেও ক্রমে ক্রমে নির্বাসিত করতে হবে।

সংস্কৃতি ও বিকৃতি

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষের মনে সংস্কৃতির পাশাপাশি বিকৃতিও ক্রিয়াশীল রয়েছে। সংস্কৃতির প্রভাব আদিম গুহাবাসী

মানবকে তার ষড়রিপুর উর্ধ্বে উঠিয়ে সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির বিকাশের কারণ হয়েছে। এরই পাশাপাশি আবার সনাতন বিকৃতি-প্রবাহও বয়ে চলেছে। যে মানুষ বা সমাজ যতটুকু পরিমাণে এই আদিম বিকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দেহ থেকে দেহাতীতের সন্ধানে যাত্রা করতে পেরেছে, তাদের আমরা ততটুকু সভ্য আখ্যা দিয়ে থাকি। আদিম মানুষ তার মানসলোকে সংস্কৃতির প্রভাবে বিকৃতিকে জয় করার পথে ক্রমশঃ বেশ কিছুটা অগ্রসর হলেও এ যাবত মানুষের গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য প্রগতি সাধন সম্ভবপর হয় নি। পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিকৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানুষ এ পর্যন্ত প্রধানতঃ দণ্ডশক্তি বা হিংসারই শরণ নিয়ে এসেছে। দণ্ডশক্তিকে ব্যক্তি-মানবের হাত থেকে সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিয়ে এ ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে মানবসমাজ প্রথম পদক্ষেপ করেছিল, তার দ্বিতীয় চরণপাত এখনও ব্যাপকভাবে হয় নি। গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ক্ষেত্রস্থ বিকৃতিকে সংস্কৃতির দ্বারা নিয়মন প্রচেষ্টাই হচ্ছে এই দ্বিতীয় চরণ। যে আদর্শ সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি সৎ ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন হবে, এই পৃথিবীতে তার আবির্ভাব কোন দিনই সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। খুব বেশী হলে হয়তো অধিকাংশ মানুষ আদর্শ সমাজোচিত বিধানাবলী মেনে চলবে, কিন্তু তা হলেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ বা আকস্মিকভাবে কোন গোষ্ঠী সাময়িক বিকৃতির কবলিত হয়ে অসামাজিক কার্যে প্রবৃত্ত হতে পারে। তাদের চিন্তা ও কর্মধারাকে পুনর্বার সমাজমুখী করার জন্য সাংস্কৃতিক উপায়ের শরণ নিতে বলা তাই সর্বোদয় বিচারধারার এক অন্যতম মহান্ অবদান এবং গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ হচ্ছে এর উপযুক্ত আয়ুধ।

আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাতেও শাসন থাকবে। তবে তা হবে মাতার শাসন এবং এরই অপর নাম প্রেমশক্তি বা সত্যাগ্রহ। শাসন-মুক্ত সমাজে তাই সত্যাগ্রহ শক্তি অপরিহার্য। এর বলে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং (যতদিন জাতীয় রাষ্ট্রের

অস্তিত্ব থাকবে) স্বদেশ আক্রান্ত হলে এর দ্বারাই দেশরক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর সহায়তা নেবার অভ্যাস যদি আমরা বর্জন করতে না পারি তা হলে কোন দিনই শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। দণ্ডশক্তি যদি আমাদের রক্ষকের পদাভিষিক্ত হয়ে থেকেই যায়, তা হলে তাকে প্রভুর আসন থেকে কেউ অপসারিত করতে পারবে না। অতএব আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষা—উভয় ক্ষেত্রের জন্যই বিকৃতি নিয়মনের সংস্কৃতিসম্মত পদ্ধতি সত্যাগ্রহের শরণ নেবার অনুশীলন নবীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাভিলাষীকে করতেই হবে।

নঈ তালিম—শাশ্বত বিপ্লব

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শাসনমুক্ত সমাজের আদর্শ দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাক্রমের দ্বারা লভ্য। বাজিকর আমের আঁঠি পোঁতা মাত্র তার থেকে গাছের সৃষ্টি হয়ে পাকা ফল ধরে। অথচ বাস্তব জীবনে বাজিকরের এই চক্ষের নিমেষে ফল ধরানোর কোন মূল্য নেই। শাসনবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা চলে। এর কোন শর্ট কাট নেই। দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা দ্বারা মানবস্বভাবের বিকৃতিকে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার জন্য সাধনা করতে হবে। বর্তমানের পরাবলম্বী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বাবলম্বী (অর্থাৎ শাসন ও শোষণবিহীন) ও সহযোগিতামূলক সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করা শাসনবিহীন সমাজের পক্ষে অপরিহার্য এবং বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ-বিপ্লবী গান্ধীজী তাই তদনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করে গিয়েছিলেন। ভ্রূণাবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাবলম্বী ও সহযোগিতা-ভিত্তিক শিক্ষা দেবার এই যে পরিকল্পনা, এরই নাম হচ্ছে নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষা মানব-মনের বিকৃতি যদি শাশ্বত হয়, তবে তার সংস্কারের উপায়কেও শাশ্বত হতে হবে এবং এই অর্থে নবীন সমাজের ভিত্তিমূল—নূতন মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নঈ তালিম তাই বিপ্লবের শাশ্বত প্রক্রিয়া।

উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সংযম

শাসনমুক্ত সমাজ অর্থে যে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ বা সংহতিবিহীন সমাজ নয়, এ কথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। অরাজকতা কারও কাম্য হতে পারে না। সর্বোদয়ের আদর্শে চূড়ান্ত সংহতি ও শৃঙ্খলা থাকবে। তবে এ শৃঙ্খলা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিষ্প্রাণ কোন ব্যবস্থা হবে না, এ হবে নৈতিক শৃঙ্খলা। "সর্বোদয় এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয় যে, মানুষ এত খারাপ উপাদানে তৈরী যে তাকে বাহ্য নিয়ন্ত্রণের জাঁতাকলে চেপে না ধরলে সে যুক্তির পথে চলবে না বা সর্বসাধারণের স্বার্থানুকূল কাজ করবে না। পক্ষান্তরে সর্বোদয়ের বিশ্বাস এই যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন আত্ম-সংযমের অধিকারী হবে, যার দ্বারা বাহ্য নিয়ন্ত্রণের প্রথা ও ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করে দেবে। অন্তিম স্থিতির আভাস দূর-দিগন্তে দেখা না গেলেও, ব্যক্তির জীবনে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় আত্মসংযমের পরিণাম বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার ফলে নিশ্চয় ধীর অথচ সুনিশ্চিত ভাবে সেইসব মানবগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রভাব নিম্নগামী হবে, যাদের বুনিয়াদ সহযোগিতা, প্রবর্তনা (persuasion), প্রেম ও প্রত্যক্ষগোচর সাধারণ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত" ('প্ল্যানিং ফর সর্বোদয়')। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "জাতীয় জীবন যদি স্বনিয়ন্ত্রিত হবার মত নিষ্কলঙ্ক স্থিতিতে উপনীত হয়, তা হলে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকে না। তখন এক সচেতন নৈরাজ্য স্থাপিত হয়। এইরকম সমাজে সকলেই নিজ নিজ শাসক। সে তখন এমনভাবে আত্মশাসন করে যে তার আচরণ কদাচ তার প্রতিবেশীর অসুবিধা সৃষ্টি করে না। সুতরাং আদর্শ স্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার চিহ্ন মাত্র থাকবে না, কারণ রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব তখন থাকবে না। কিন্তু মানুষ তার জীবিত কালে আদর্শের ষোল-আনা রূপায়ণ করতে পারে না। আর তার জন্যই থোরোর সেই চিরায়ত উক্তির

সার্থকতা, 'সেই শাসন-ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে'।" (২-৭-১৯৩১)

অন্তিম রূপ

শাসনবিহীন সমাজের অন্তিম বৈধানিক রূপ কেমন হবে? গান্ধীজী এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে যান নি। তিনি কেবল এইটুকুই বলেছেন যে, "আদর্শ অহিংস স্থিতির অপর নাম হচ্ছে নৈরাজ্য।" বস্তুতঃ, কোন সুদূরের বিষয় সম্বন্ধে গান্ধীজী সাধারণতঃ অভিমত প্রকাশ করতেন না। "বাস্তবপন্থী আদর্শবাদী" হবার জন্য তিনি অতি দূরের বিষয় সম্বন্ধে চিন্তাকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করতেন। তাই তাঁর কাছে "পরবর্তী পদক্ষেপই যথেষ্ট" ছিল। পরবর্তী পদক্ষেপই যথাযথ হলে আদর্শের সঙ্গে বর্তমান স্থিতির ব্যবধান আরও এক কদম কম হয়ে গেল—এ কথা সুনিশ্চিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর বিশিষ্ট স্বভাব ও কর্মপদ্ধতির জন্য তিনি নিজের বিচারধারাকে কখনও বাঁধা-ধরা তত্ত্ব (abstract theory) হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেন নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল থেকে তিনি তার অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতেন। তাই তাঁর পক্ষে অনন্তের অন্তে কী আছে—এই তাত্ত্বিক আলোচনায় যোগদান করা সম্ভব ছিল না। অতএব শাসনবিহীন সমাজের অন্তিম রূপ প্রয়োগলব্ধ ব্যাপার। বর্তমানে এ সম্বন্ধে কেবল সাধারণভাবেই মন্তব্য করা চলে। সর্ব সেবা সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক ভঙ্গীতে বলেন যে, শাসনবিহীন সমাজে যে অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে, তার অবস্থা হবে রেলওয়ে ট্রেনের বিপদ সংকেতসূচক শিকলের মত। সাধারণ অবস্থায় এই অ্যালার্ম চেনের কথা কোন যাত্রী খেয়াল রাখে না, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিন্তু তেমন কোন বিপদ দেখা দিলে এর সাহায্য নেওয়া চলে। শাসনবিহীন সমাজের সুস্থ রূপের উদাহরণ দান প্রসঙ্গে তিনি একে ফুলের মালার

সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মালার ফুলগুলি সব স্বতন্ত্র; একটি সূক্ষ্ম সুতা তাদের একত্র গ্রথিত করে মালার রূপ দেয়। এই মালার সুতা যদি দেখা যায় তবে বুঝতে হবে যে ফুল শুকাচ্ছে বা ফুলে পচন ধরেছে। তেমনি সুস্থ শাসনবিহীন সমাজের এককগুলি যে ন্যূনতম ঐচ্ছিক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থারূপী সম্বন্ধ-সূত্র দ্বারা বিধৃত হয়ে এক মানবসমাজের রূপ পরিগ্রহ করবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী থাকবে। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় তার অস্তিত্ব অনুভূত হবে না।

অদলীয় গণতন্ত্র

গান্ধীজীর কোন বক্তব্য বা আদর্শ কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে প্রয়োগের জন্য নয়। বাস্তববাদী বিপ্লবী গান্ধীজী তাই এখনই এই আদর্শাভিমুখে চলার পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে অদলীয় গণতন্ত্র। প্রখ্যাত গান্ধীপন্থী পণ্ডিত আচার্য দাদা ধর্মাধিকারীর বিচারধারা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "সমগ্র রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন যেখানে উঠবে, সেখানে এ কার্যের সাধন, কর্মসূচী ও সংস্কারের গতিবেগ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ অবশ্যই থাকতে পারে এবং এরকম অল্প-বিস্তর মতানৈক্য থাকা ভালও। কিন্তু বিকেন্দ্রিত শাসন-ব্যবস্থার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শোষণের অবকাশ হ্রাস পেতে থাকবে এবং নাগরিকদের পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরূপেও পরিবর্তন দেখা দেবে। আজকের সমাজের ন্যায় প্রবল পরস্পরবিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব তখন থাকবে না। তাই তখনকার সেই সব বিভিন্ন বিচার-সম্প্রদায় এখনকার ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী দলের মত হবে না। সমাজের বিলি-ব্যবস্থা আমাদের হাতে থাকুক—এ আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে থাকলেও তাঁদের মুখ্য ভূমিকা ক্ষমতা-মূলক হবে না। ওই অবস্থায় যদি আদৌ কোন দল থাকে তা হলে তার স্বরূপ এমন পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে আজকের লক্ষণ মিলিয়ে তাকে আর চেনা যাবে না।

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালে কী করতে হবে ? এ সম্বন্ধে আমার অভিমত হচ্ছে :

"(১) প্রত্যেকটি দল মিলিতভাবে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করে শুদ্ধ হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা নেবেন যে, কোন দল কোন রকম পরিস্থিতিতেই হিংসাত্মক বা অসত্য সাধনের শরণ নেবেন না। এই নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী যদি কোন দল বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন, তা হলে ওই দলের নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রথম তাঁদের কার্যের নিন্দা করবেন।

"(২) নির্বাচনকে সকল দলই জনশিক্ষার মহাপর্ব বিবেচনা করবেন ; একে ক্ষমতা প্রাপ্তির দ্বন্দ্বের চিরস্থায়ী সুযোগ জ্ঞান করলে চলবে না। এই জন্য সকল দল সম্মিলিতভাবে এই পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করবেন যে, কোন প্রাথা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্বন্ধে লোক-মানসে অনাদর ও অবিশ্বাস সৃষ্টির প্রয়াস করবেন না। প্রতিটি দলের মনে অপর দল সম্বন্ধে এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতা ও সততা সহকারে নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করেছেন। প্রত্যেকেই অপর পক্ষের সততা ও চারিত্রশক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বিশ্বাস বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। প্রতিটি দলের উচ্চ-স্থানীয় নেতৃবর্গ সমাজে পারস্পরিক মর্যাদা ও মতপ্রচারের সুবিধ বৃদ্ধির জন্য যত্নশীল হবেন।

"(৩) অধিকাধিক সংখ্যায় ভোট সংগ্রহ করা নির্বাচনের মুখ্য লক্ষ্য হবে না, নির্বাচনের কাজ হবে জনসাধারণের মনোভূমিকা তৈরী করা। অতএব প্রার্থীদের প্রচার "মত যাচ্ঞার" পরিবর্তে "মত পরিবর্তনের" জন্য হবে।

"স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য নিষ্পক্ষ লোকনীতি বহুদিন থেকেই গান্ধী-পরিকল্পনার এক অঙ্গ। বিকেন্দ্রিত ক্ষেত্রে আজও একে ব্যবহার্য ও বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই নীতি কতদূর কার্যকর ও হিতকর হবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। এইজন্য আমি দলভেদের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েই "পক্ষাতীত লোক-

নীতির” ভিত্তি স্থাপনা করার প্রস্তাব করছি। আমি “পক্ষরহিত গণতন্ত্রের” কথা বলছি না। গণতন্ত্রে কিছু-সংখ্যক ব্যক্তি পক্ষনিষ্ঠ হলেও জনগণ সর্বদাই পক্ষাতীত হয়ে থাকে। এই যে পক্ষাতীত “জনগণ” নামধেয় “বিভূতি”, এই হচ্ছে সত্যকার গণতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী। আমাদের এ বিষয়ে সাবধান থাকা প্রয়োজন যে, দলীয় ক্ষমতার চেয়েও এই বিভূতির শক্তি যেন শ্রেয়ঃ হয়।”

দাদা ধর্মাধিকারীর প্রস্তাব এতদভিমুখী প্রতীক মাত্র। চিন্তা করলে এই-জাতীয় সদিচ্ছাদ্যোতক আরও অনেক প্রস্তাব রচনা করা যেতে পারে।

যুগোশ্লাভিয়ার বিকেন্দ্রিত গণতন্ত্র

পূর্বোক্ত বক্তব্য কোন অবাস্তব কবি-কল্পনা নয়। আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ায় এই-জাতীয় বিকেন্দ্রিত দলবিহীন গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে। ওই দেশের পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাই শাসনমুক্ত সমাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের কাছে লাভদায়ক হবে বলে মনে হয়। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, অপর যে কোন একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রের ন্যায় যুগোশ্লাভিয়াতেও টিটোর একাধিনায়কত্ব চলছে। তাই যুগোশ্লাভিয়ার শাসন-ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই আদর্শ স্থিতি বলে চিত্রিত করার প্রয়াস করা হচ্ছে না। বিকেন্দ্রিত ও দলবিহীন গণতন্ত্রের পূজারীরা ওই দেশ থেকে যতটুকু গ্রহণযোগ্য কেবল ততটুকুই নেবেন।

যুগোশ্লাভিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার অপরাপর কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মত কেন্দ্রিত শক্তির প্রতীক হলেও নিম্নতর স্তরে যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ রয়েছে এবং ওই দেশের জনসাধারণও সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রূপায়ণের প্রয়াস করছে। গ্রাম ও শহরে পিপলস কমিটি যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন করে। ওই এলাকার পুলিশ, কলকারখানা ইত্যাদি সবই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পিপলস কমিটির হাতে থাকে। নিজেদের এলাকার সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদি

পিপলস কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাপার। এমন কি জেলাতেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইত্যাদির পদে ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশের মত সরকার কাউকে উপর থেকে চাপিয়ে দেয় না। এ সব পদে কর্মচারী নিয়োগ জেলার পিপলস কমিটি করে থাকে এবং কর্মচারীদের পিপলস কমিটির অধীনে কাজ করতে হয়। পিপলস কমিটির দুটি অঙ্গ—উচ্চ-পরিষদ ও নিম্ন-পরিষদ। গ্রামে কৃষি বা কলকারখানায় যারা প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক কাজ করে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিম্ন-পরিষদ গঠিত হয়, এবং উচ্চ-পরিষদে থাকে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি।

যুগোশ্লাভিয়ার নির্বাচন-ব্যবস্থাও অভিনব। সেখানে অবশ্য কোন বিরোধীদলের অস্তিত্ব না থাকায় ভারত ইত্যাদি দেশের মত নির্বাচনে একাধিক দলের প্রতিনিধি দাঁড়াবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে বোধ হয় অন্য বহু দেশের তুলনায় অধিক মাত্রায় নিজেদের স্বাধীন বিচারশক্তি ব্যক্ত করার ক্ষমতা পায়। এমন কি চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষস্থানীয় দুই-চার জন নেতা সমগ্র দেশের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করে দেন এবং জনসাধারণ হয় এ দল বা সে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতার নির্বাচিত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। যুগোশ্লাভিয়ায় কিন্তু নির্বাচন নীচের স্তর থেকে হয়। মনে করা যাক পার্লামেণ্টের কোন সদস্য-নির্বাচন-কেন্দ্রে ষাটটি ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্র আছে ও প্রতিটি কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা এক হাজার। প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রতিটি ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্রের ভোটারদের সার্বজনীন সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ভোটাররা দুই-চার জন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এইভাবে সমগ্র নির্বাচন ক্ষেত্রে দুই-তিন শত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ও তাঁরা এক সভায় সম্মিলিত হয়ে সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করেন। এক নির্বাচন ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারেন। পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের সভায় যাঁরা অন্ততপক্ষে শতকরা ত্রিশ বা

চল্লিশটি ভোট পান, তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার লাভ করেন। নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রত্তিটি প্রার্থী সমান অর্থ পান। সুতরাং টাকার জোরে নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার উপায় সেখানে নেই। যুগোশ্লাভিয়ার এই ব্যবস্থা কেবল ভালভাবে চলছেই না, বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরও প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

নির্বাচন-ব্যবস্থা ও শাসনমুক্ত সমাজ

পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, প্রচলিত নির্বাচন ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়? স্বভাবতঃই শাসনমুক্ত সমাজ রচনাকামীর পক্ষে প্রাদেশিক বিধানসভা বা লোকসভায় সদস্য হয়ে সরকারী বা বিরোধী দলে যোগদান করে রাষ্ট্র যন্ত্রের অঙ্গ হওয়া চলে না। অদলীয় গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, কোন দল বিশেষের প্রতিনিধি হওয়া বা এরূপ কোন প্রতিনিধিকে ভোট দেওয়াও সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবাদীরা (সরকারী বা বিরোধী দল নির্বিশেষে) রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপর অহেতুক গুরুত্ব ও মর্যাদা আরোপ করার জন্য শাসন-যন্ত্র এবং তা দখলের উপায়—সংসদীয় নির্বাচনকে অতীব মহত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে চিত্রিত করে থাকেন। শাসনমুক্ত সমাজ রচনাকারীকে এই মায়াজাল ছিন্ন করতে হবে। তাঁকে স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, রাষ্ট্র-যন্ত্র ও এই যন্ত্রের চালকের পদে আসীন হবার প্রক্রিয়া —রাজনীতি সমাজের বহুবিধ কার্যকলাপের মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং সংসদীয় রাজনীতিকেই মোক্ষ জ্ঞান করার কোন কারণ নেই।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের হ্যারল্ড লাস্কি প্রমুখ প্লুরালিস্টদের যুক্তি সর্বোদয় বিচারের অত্যন্ত কাছাকাছি। প্রচলিত রাজনীতি সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "বহু দিন যাবত আমরা এই চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, কেবল বিধান সভা ইত্যাদির মারফতই ক্ষমতা আসে। এই বিশ্বাসকে আমি জার্জ্য

এবং সম্মোহন সঞ্জাত এক গভীর ভ্রান্তি আখ্যা দিয়ে থাকি। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পল্লবগ্রাহী জ্ঞান আমাদের মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, পার্লামেন্ট থেকে অনুস্রাবিত হয়েই যাবতীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তগত হয়। সত্য ব্যাপার হচ্ছে যে, জনসাধারণের হাতেই নির্বূঢ় ক্ষমতা থাকে এবং সাময়িকভাবে তাঁরা যাঁকে নিজেদের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচন করে, তাঁর কাছে এই ক্ষমতা গচ্ছিত করা হয়। জনসাধারণকে বাদ দিলে পার্লামেন্টের কোন ক্ষমতা বা এমন কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। গত একুশ বৎসর যাবত জনসাধারণকে আমি এই সহজ সত্যটুকু বোঝাবার চেষ্টা করছি।" (গঠনমূলক কার্যক্রম—১৯৪৫)

যদিও এ কথা স্পষ্ট যে, সংসদীয় কার্যকলাপের দ্বারা সর্বোদয় সমাজ মূর্ত হবে না এবং সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী স্বয়ং কোন রকম সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন না, তবুও জনজীবনে নির্বাচনের গুরুত্বের কথা স্মরণ রেখে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী একে যথাসম্ভব নিজ আদর্শের পরিপূর্তির কাজে লাগাবার প্রয়াস করবেন। আদর্শ গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জনশক্তির সংগঠনের জন্য সর্বোদয় কর্মীরা জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিজ প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। প্রতি এলাকায় ভোটারদের সংগঠিত করে যুগোশ্লাভিয়ার ধরনে ভোটারদের সমিতি গঠন করা হবে। একটি নির্বাচনক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় এই সব ভোটারদের প্রতিনিধিরা মিলে নিজেদের ভিতর থেকে এক বা একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেন। শতকরা ত্রিশ চল্লিশ বা ঐরকম ভোট যেসব প্রার্থী প্রাথমিক নির্বাচনে পাবেন, তাঁরা সবাই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ভোটারেরা স্বয়ং যদি এইভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেন তা হলে নির্বূঢ় স্বাধীনতার পথের অন্যতম বাধা রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা পর্যন্ত যদি এইভাবে

জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করানো যায় তা হলে যে জনশক্তির উদ্‌গম ও বিকাশ হবে তার সহায়তায় অর্থ-ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে দেশরক্ষা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক শ্রেণীর চালিত যাবতীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খর্ব করা সম্ভবপর হবে। আর ব্যবস্থাপক শ্রেণী কর্তৃক সঞ্চালিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা চালিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে শাসনমুক্ত সমাজ বা আদর্শ গণতন্ত্র কোন দিনই সাকার হতে পারবে না। এইভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হলে জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে এবং শাসন-মুক্ত সমাজের অভিমুখে অগ্রসর হবার সাহসও তাঁদের মধ্যে জাগবে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে। শাসনমুক্ত সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় সর্বোদয় কর্মীর ভূমিকা হবে পথপ্রদর্শকের—লোকশিক্ষকের। কর্মী এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করবেন না, সমস্ত অভিক্রম হবে জনসাধারণের।

বিহারদানের পর বিহারের কর্মীরা সমগ্র প্রদেশকে সর্বোদয় আদর্শে গড়ার জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে যে ষড়বিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন—এ প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়। পরবর্তী নির্বাচনে গ্রামদানী গ্রাম নিজেদের—একমাত্র নিজেদের—প্রার্থীকে ভোট দেবেন—এই পদক্ষেপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা।

গ্রন্থপঞ্জী

Socialism to Sarvodaya	জয়প্রকাশ নারায়ণ
লোকনীতি (হিন্দী)	আচার্য বিনোবা ভাবে
স্বরাজ্য শাস্ত্র "	"
শাসনমুক্ত সমাজ কী ওর (হিন্দী)	ধীরেন্দ্র মজুমদার
গ্রামদান	চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী
রাজনীতি সে লোকনীতি (হিন্দী)	বিনোবা, জয়প্রকাশ প্রভৃতি
Gandhian Conception of State	ড. বিমানবিহারী মজুমদার

The Political Philosophy of Mahatma Gandhi	ড. গোপীনাথ ধাবন
শিক্ষা	মো. ক. গান্ধী
নঈ তালিম	ধীরেন্দ্র মজুমদার
সত্যাগ্রহ	মো. ক. গান্ধী
সত্যাগ্রহের কথা	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
A Plea for Reconstruction of Indian Polity	জয়প্রকাশ নারায়ণ
সর্বোদয়	মো. ক. গান্ধী
Selections from Gandhi	নির্মলকুমার বসু
মেরী বিদেশযাত্রা (হিন্দী)	জয়প্রকাশ নারায়ণ
Twentieth Century Socialism	সোসালিস্ট ইউনিয়ন
A Philosophy of Indian Economic Development	রিচার্ড গ্রেগ
Work and Community	ফ্রেড ব্লুম
Social Responsibility of Business	ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল সেণ্টার
New Forms of Ownership in Industry	ফোকার্ট উইলকেন
যুগোস্লাভিয়া কা লোকস্বরাজ্য (হিন্দী)	প্রভাকর জোশী

॥ ৯ ॥

প্রতিরক্ষার প্রশ্ন

শাসনমুক্ত অর্থাৎ অহিংস সমাজের কথা উঠা মাত্রই অবিশ্বাসীরা এই বলে এর বিরোধিতা করেন যে তা হলে দেশরক্ষার উপায় কী হবে? বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নই অনেক সময় বহু অহিংসায় বিশ্বাসীকে রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তিকে অপরিহার্য পাপরূপে স্বীকার করতে বাধ্য করায়। সুতরাং সর্বোদয় সমাজে দেশরক্ষার কী হবে—এর কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা ভাল। অহিংস পদ্ধতিতে দেশরক্ষার উপায় সম্বন্ধে যাঁরা বিশদ্‌ভাবে জানতে চান তাঁদের রিচার্ড গ্রেগ লিখিত 'দি পাওয়ার অফ্‌ ননভায়লেন্স' বইখানি পড়তেই হবে। এ ছাড়া কম্যাণ্ডার কিং-হল লিখিত 'ডিফেন্স ইন দি নিউক্লিয়র এজ' গ্রন্থটিও পড়া উচিত। কম্যাণ্ডার কিং-হল ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা সেনাপতি ও রণশাস্ত্রবিদ্‌। আধুনিক মারণাস্ত্রের সর্ববিধ্বংসী গতিপ্রকৃতি দেখে তিনি শেষ অবধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অহিংসা ছাড়া আজকের দুনিয়ায় সহিংস পদ্ধতিতে কোন জাতির আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর নয়। প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিক বার্টর্যাণ্ড রাসেল তো সম্প্রতি এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, সহিংসপন্থায় দেশরক্ষা করতে গেলে তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াসমূহ এমন ভয়ঙ্কর হয় যে, বিশ্বমানবের কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে তার চেয়ে বরং কোন রকম প্রতিরোধ না করে পরাধীনতা বরণ করাও ভাল। সহিংসপন্থায় আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টার আর যে কোন মূল্য নেই সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'কমনসেন্স এণ্ড নিউক্লিয়র ওয়ার' নামক পুস্তকে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত রণ-বিজ্ঞানী ক্যাপটেন লিডল-হার্টও অনুরূপ কারণে হাইড্রোজেন ও পারমাণবিক বোমার বিরোধী। বিক্রম সারাভাই একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। গান্ধীবাদী হবার অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারবেন না। তিনিও এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় মন্তব্য করেছেন যে, মহাশূন্যে

'আবর্তনরত কৃত্রিম উপগ্রহ সমূহ থেকে যখন আমাদের উপর নিরন্তর নজর রাখা হচ্ছে এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও সমুদ্রতলে অদৃশ্য পারমাণবিক সাবমেরিনের মারণাস্ত্র যখন আমাদের দিকে ত্যাগ-করা তখন চিরাচরিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিরর্থক হয়ে পড়েছে।

একটি ভুল ধারণা

এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমাদের মন থেকে একটি ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া দরকার। অহিংস সমাজব্যবস্থার বিরোধীরা ভাবেন যে পৃথিবীর আর সব রাষ্ট্রের গঠন বা ঐ সব দেশের অধিবাসীদের মানসিকতা আজকেরই মত রয়ে যাবে এবং তার মধ্যে বিশেষ কোন একটি দেশ পূর্ণ মাত্রায় অহিংসার পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, সর্বোদয় এক আন্তর্জাতিক বিচারধারা এবং এককভাবে কোন দেশে পূর্ণমাত্রায় সর্বোদয়সংগত বিধিব্যবস্থা কয়েম করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ দেশের অধিবাসীরা প্রতিবেশীর তুলনায় অহিংসার পথে অল্পবিস্তর বেশী অগ্রসর হতে পারেন। একটি দেশ অহিংস এবং আর সবাই পুরাতন মূল্যবোধ মেনে চলেছে—এ রকম হতেই পারে না। কোন দেশ সর্বোদয়ের পথে চলা শুরু করলে তার প্রভাব প্রতিবেশী দেশ সমূহে পড়তে বাধ্য এবং পূর্ণমাত্রায় সর্বোদয়ের অনুগামী হয়ে সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেবার পর্যায়ে উপনীত হবার পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহেও মোটামুটি তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হবে। সুতরাং বিশ্বমানসিকতার যে পর্যায়ে পূর্ণমাত্রায় সৈন্যবাহিনী লুপ্ত হবে তখন বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা বিশেষ একটা থাকবে না বললেই চলে।

অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতেও এমন অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না যখন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এতটা আদর্শবাদী হয়ে গেছে যে তাদের মধ্যে আর কখনও ভুল-বোঝাবুঝির কারণে সংঘর্ষ হয় না বা কোন রণোন্মাদের বিশ্ববিজয়ী হবার উচ্চাভিলাষ দুটি জাতিকে যুদ্ধে লিপ্ত করে না। শেষ অবধি অবশ্য সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবারে পরিণত

হলেও মানুষের মূঢ়তার জন্য এখন অনেক দিন পর্যন্ত জাতি-আধারিত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব থেকেই যাবে এবং তাই সংঘর্ষেরও সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং অহিংস সমাজব্যবস্থায় দেশরক্ষার প্রশ্ন একেবারে তাত্ত্বিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অহিংসার প্রবক্তাদের এর জবাব দিতেই হবে।

বিদেশী আক্রমণের কারণ

প্রথমে দেখা যাক বিদেশী আক্রমণ হয় কেন? বিদেশী আক্রমণের পিছনে মোটামুটি দুটি কারণ থাকে: (১) আক্রান্ত রাজ্যের আর্থিক সম্পদ্ লুণ্ঠন, (২) তাদের উপর প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষা। প্রথমটির প্রেরণা আর্থিক এবং দ্বিতীয় কারণ মনোবৈজ্ঞানিক। অহিংস সমাজব্যবস্থার সদস্যদের নিজ দেশের ভৌতিক সম্পদ কেবল দেশবাসীর সঙ্গেই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি নাগরিকের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে ভারতবর্ষকে তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার অধিবাসী দরিদ্র আফ্রিদি বা ওয়াজিরীদের এ দেশের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিয়ে পরিশ্রম করে পেট চালানোর সুবিধা করে দিতে হবে। আজ রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি দেশে যে বাড়তি ভূমি-সম্পদ রয়েছে এসিয়া, আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের তার উপর সমান অধিকার থাকা উচিত। কেবল তা হলেই এ সব অভাবগ্রস্ত এলাকার অধিবাসীরা পূর্বোক্ত সমৃদ্ধ দেশের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হবে না এবং তা হলেই কেবল তাদের মনে ঐ সব দেশ আক্রমণের ইচ্ছা জাগবে না। বিনোবাজী যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ভূদানের কথা বলেন, তা এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক।

অহিংস প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা

অহিংসাপন্থী দেশের অধিবাসীরা অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে খেতে চাইলেও তারা হয়ত লোভ ও মোহ বশতঃ মূল অধিবাসীদের তুলনায় অধিক মাত্রায় ভৌতিক সম্পদ উপভোগের জন্য

লালায়িত হয়ে উঠল, অথবা যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ, অর্থাৎ নিছক প্রভুত্ব করারূপী বিকৃত মানসিকতার কারণে কেউ কোন দেশ আক্রমণ করল— এমতাবস্থায় আক্রমণকারীর প্রতিরোধ না করা ভীরুতার লক্ষণ এবং ভীরুতা অহিংসা নয়। সুতরাং অহিংস সমাজের নাগরিকদের সত্যাগ্রহের দ্বারা আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এককভাবে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও ব্যাপকভাবে কি এর প্রয়োগ করা যায়? এর জ্বলন্ত উদাহরণ দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ থেকে শুরু করে চম্পারণ সত্যাগ্রহ এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাপর গৌরবজনক সত্যাগ্রহ সমূহ। কোন দেশের অধিবাসীদের আর্থিক শোষণ করতে হলে সে দেশবাসীর অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় সমর্থন চাই। কেবল মুষ্টিমেয় বিদেশী কখনও নিজ শক্তিতে কোন দেশের অধিবাসীদের আর্থিক শোষণ করতে পারে না। সুতরাং যতই নিগ্রহের আশঙ্কা থাক না কেন, শোষিত জনসাধারণ যদি অসহযোগিতা করে তা হলে কারও পক্ষে তাদের শোষণ করা সম্ভব নয়। বড় বেশী হলে শোষণকামী তাদের হত্যা করতে পারে, কিন্তু আর্থিক শোষণ করতে পারে না। প্রভুত্ব করা সম্বন্ধে ঐ একই কথা। আক্রান্ত দেশের অধিবাসীরা অন্ততঃ নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রভুত্ব স্বীকার করে না নিলে দুর্ধর্ষ শক্তিশালীর পক্ষেও প্রভুত্ব করা সম্ভব নয়। আর শ্মশানের অধিপতি হবার জন্য, অর্থাৎ প্রভু বলে স্বীকার করার মত কেউ না থাকলে নিশ্চয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী কেউ পররাজ্য আক্রমণ করতে যাবে না।

কতটা সম্ভব?

প্রশ্ন উঠবে যে, ভারতের অতীত সংস্কৃতি ও ধর্মে অহিংসার প্রভাব ছিল এবং এদেশে গান্ধীর মত অহিংসার দৃঢ় বিশ্বাসী নেতার উদ্ভব হয়েছিল বলে ভারতবর্ষ কিছু মাত্রায় ব্যাপক অহিংসার প্রয়োগে সফলকাম হয়েছিল; কিন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশে কি এর প্রয়োগ সম্ভবপর?

ব্যাপক অহিংসাত্মক প্রয়োগ অতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্স জোসেফ হাঙ্গারীর আর্থিক শোষণ ও ঐ দেশের উপর প্রভুত্ব করার জন্য হাঙ্গারী দখল করেন। কিন্তু ফ্রান্সিস্ ডিক-এর নেতৃত্বে হাঙ্গারীতে যে ব্যাপক অসহযোগ ও করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার পরিণামে অস্ট্রিয়ান সম্রাটকে শেষ অবধি হাঙ্গারীর স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়। আলডুস হাক্সলে তাঁর 'বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি' নামক পুস্তকে আর একটি ইউরোপীয় সত্যাগ্রহের বিবরণ দিয়েছেন। "১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রূঢ় ও প্যালাটিনেটের জার্মানেরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছিল। এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দর্শন নীতি এবং সংগঠন—এ তিনের কোন দিক থেকেই এ সত্যাগ্রহের জন্য আগে থেকে কিছুমাত্র প্রস্তুতি করা হয় নি। শেষ পর্যন্ত এরই জন্য তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও এত দীর্ঘকাল ধরে এ চলেছিল যে পাশ্চাত্ত্য জাতির (বিশেষতঃ এমন একটি জাতি, অন্যের চেয়ে যারা অধিক মাত্রায় জঙ্গী নীতি গ্রহণ করেছে) যে সানন্দে আত্মনিগ্রহ সহ্য করে অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে, তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।" কোয়েকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অহিংসা-নিষ্ঠার জন্য তাঁদের নিগ্রহ বরণের দীর্ঘ ইতিহাস পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর ব্যাপক ও সংগঠিত অহিংসা-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ডেনমার্ক নরওয়ে প্রমুখ বহু ইউরোপীয় দেশেও আক্রমণকারী জার্মানদের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যাপক নিরস্ত্র প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে। আজও আফ্রিকার নিগ্রো সমাজ মানবীয় অধিকার লাভ করার জন্য যে আন্দোলন করছে তার একটা বিশিষ্ট অংশ অহিংসা-আধারিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা ও মণ্টগোমারীতে মার্টিন লুথার কিং প্রবর্তিত পন্থায় তত্রস্থ কৃষ্ণকায়েরা বাস বয়কট, ভোজনাগারে অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি যে সব অহিংসাত্মক আন্দোলনের দ্বারা সমানাধিকার প্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে—তাও যে কোন

জাতির পক্ষে ব্যাপক সত্যাগ্রহে সাফল্যলাভের যুক্তিকে পরিপুষ্ট করে। নেতার আকস্মিক পরলোকগমন আমেরিকার কৃষ্ণকায়দের অহিংস আন্দোলনের শক্তিকে যে কুণ্ঠিত করতে পারবে না—তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

অগণতান্ত্রিকের উপর সত্যাগ্রহ সফল হবে কি?

কেউ কেউ বলেন যে, যাদের উপর সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা হচ্ছে তারা যদি মোটামুটি গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আস্থাশীল হন, তা হলেই অহিংস প্রতিরোধ সাফল্য লাভ করতে পারে। ফ্যাসিস্ট বা কমিউনিস্ট একনায়কত্ববাদী শাসন-ব্যবস্থার আওতায় সত্যাগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন তার ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, জেনারেল স্মাটসের মত একাধিনায়ক রাষ্ট্রনায়ককেও অহিংসার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। বর্তমানের দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও গণতন্ত্রের বিশেষ ধার ধারেন না—এমন কি ওদেশের অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গই মোটামুটি স্বৈরতন্ত্রী। তবু পরলোকগত রেভারেণ্ড লুথুলি সহ দেশের কৃষ্ণকায়দের বহু নেতাই নিজেদের মুক্তি আন্দোলন অহিংস পদ্ধতিতেই চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব জার্মানীর বিদ্রোহের সময় সোভিয়েট সরকারের জনসাধারণকে পীড়ন করার আদেশ অগ্রাহ্য করে সতের জন রুশ সামরিক কর্মচারী প্রাণ দেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গারীর জনসাধারণ সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তা-ও প্রথম দিকে মোটামুটি অহিংস ছিল। “করতাল” নামে পরিচিত হাঙ্গেরীয়দের ব্যাপক ধর্মঘট ভারতীয় হরতালেরই অপভ্রংশ এ কথা অনেকে বলেছেন। হাঙ্গারীর প্রতিরোধ অবশ্য পূর্ণতঃ অহিংসা সম্মত ছিল না। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের চেকোশ্লোভাকিয়ায় ট্যাঙ্ক বনাম নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধের কথাও স্মরণীয় এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধর্ষণের প্রতিবাদে রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসনীয় প্রতিবাদ সত্যাগ্রহ আখ্যা পাবার উপযুক্ত।

যদি এ কথা কল্পনা করে নেওয়া যায় যে, কোন আদর্শ অহিংস প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রী সরকারের দমন নীতির সামনে সাময়িক পরাজয় বরণ করল, তবু তার দ্বারা অহিংসার দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। কারণ এই যুক্তি গ্রহণ করলে অনেক পূর্বেই সহিংস প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অস্ত্রবলে আত্মরক্ষা করতে কৃতসংকল্প পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পরিণাম এবং অস্ত্রবলে বিজয়ী হবার আশায় উদ্বুদ্ধ ইটালী, জার্মানী অথবা জাপানের পরিণতি কি এই শিক্ষাই দেয় না ?

দেশরক্ষার বুনিয়াদ

আসলে দেশরক্ষার মূলশক্তি ভাড়াটে বা বেতনভুক্ সৈন্যবাহিনী নয়—দেশের জনসাধারণ। দেশবাসী যদি দেশের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত হয়, তাদের মনে যদি এই বিশ্বাস ওতপ্রোত থাকে যে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো তাদের পক্ষে কল্যাণকারী, তা হলে তারা জীবনপণ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা করার চেষ্টা করে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যা রক্ষা করতে চাই তা কোন ব্যক্তি বা দলের রাজত্ব নয়। মানুষ—বিশেষ করে সাধারণ মানুষ ও তার পূর্ণবিকশিত জীবনের স্বাদ পাবার অধিকার আমরা রক্ষা করতে চাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার জনসাধারণ যে অস্ত্রবলে জার্মানদের তুলনায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দেশরক্ষার জন্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়, তার মুখ্য কারণ নিজ দেশের সমাজব্যবস্থার প্রতি তাদের আকর্ষণ। জাপানের তুলনায় অস্ত্রবলে দুর্বল হলেও চীন যে দীর্ঘকাল ধরে জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ করে, তার মূলে ছিল চীনা জনসাধারণের স্বদেশ-প্রেম ও মনোবল। ঐ চীনা জনসাধারণই আবার চ্যাং-কাইশেকের দুর্নীতিপরায়ণ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়ায় জাতীয়তাবাদীরা অস্ত্রবলে বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের কাছে

পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিনোবাজী যে গ্রাম স্বরাজের কর্মসূচিকে "ডিফেন্স মেজার" হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন, তার মূলেও এই কারণ বিদ্যমান। শোষণ ও শাসনরহিত সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা তাই বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা।

বাস্তববাদী ও দেশরক্ষার সমস্যা

নিছক প্র্যাগমাটিক দৃষ্টিতেও যদি বিচার করা যায় তবে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দেশরক্ষা করার পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা ধরা পড়বে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারতের মোট ১৩১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা সরকারী ব্যয়ের ভিতর সামরিক খাতে খরচ হত ৪৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদি পর্ব থেকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তথা যাবতীয় নেতৃবৃন্দ সামরিক ব্যয় হ্রাস করার দাবি করার পর ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, বিভক্ত ভারতবর্ষের মোট সরকারী ব্যয় ৬৭৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৬৬ কোটি টাকাই সৈন্য বিভাগের পিছনে খরচ হয়েছে। আর বর্তমান (১৯৬৮-৬৯ সনে) বৎসরে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০১৫ কোটি টাকা! কেবল যে ভারতবর্ষই স্বাধীতা লাভ করার পর এইভাবে সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে তাই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার নবস্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রতিটি দেশই একই পথের পথিক। কিন্তু এইভাবে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহকে বঞ্চিত করে, দেশবাসীর অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, সৈন্যবল বৃদ্ধি করার পরিণাম কী হচ্ছে? ভারতের সামরিক শক্তির বিচার করলেই এ কথা বোঝা যাবে। ভারতের সৈন্যবল খুব বেশী হলে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, যথা পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান বা সিংহলের চেয়ে বেশী। প্রতিরক্ষা ব্যয় বিপুলভাবে বাড়ানোর পর বর্তমানে হয়ত বা ভারত এককভাবে চীনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু রাশিয়া বা আমেরিকা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে ভারত তার জাতীয় আরো

সবটুকু সৈন্যবিভাগের পিছনে খরচ করলেও সাত দিনের জন্য আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ডঃ সারাভাই-এর অনুসরণে পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, আজকের এই পারমাণবিক অস্ত্র এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে পুরাতন কালের সৈন্যবাহিনী এবং কামান বন্দুক বোমা ইত্যাদি নিরর্থক হয়ে গেছে। আর ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের পক্ষে শত চেষ্টা করলেও রাশিয়া ও আমেরিকার মত ঐ জাতীয় পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সম্ভব হবে না। পৃথিবীর দুই চারিটি দেশ ছাড়া আর কারও এতদুপযোগী অর্থ-সংগতি নেই। সুতরাং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদ্বারা দেশ রক্ষা করার শিশুসুলভ কল্পনা বর্জন করে আত্মরক্ষার অন্য পন্থা অর্থাৎ অহিংস পন্থার শরণ নেওয়া উচিত।

বিশ্ব-বিবেকের ভূমিকা

ধীর গতিতে হলেও নিশ্চিত ভাবে বিশ্বের বিবেক আজ জাগ্রত হচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সুয়েজ খাল এলাকাকে কেন্দ্র করে মিশরের সঙ্গে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইজরাইলের যে সংঘর্ষ তা নিবারিত হয়েছিল বিশ্ব-জনমতের চাপে। আবার কোরিয়া, লাওস এবং কঙ্গোতে যে রক্তক্ষয় হয়েছে, তার চেয়ে বহু গুণ বেশী হত যদি না এই বিশ্বজনমতের প্রভাব শক্তিশালী হত। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বহু রাষ্ট্র আজ যে ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অছি কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অথবা পরোক্ষ প্রভাবে ক্রমশঃ স্বাধীনতা লাভের পথে এগিয়ে চলেছে, বিশ বৎসর পূর্বেও তা অকল্পনীয় ছিল। চীন-ভারত ও পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও এই বিশ্ব-বিবেকের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি এবং বর্তমানে বহুবিতর্কিত ভিয়েৎনাম সমস্যারও যে একটা সমাধানের প্রয়াস শুরু হয়েছে তারও মূলে আছে জাগ্রত বিশ্ব-বিবেক। সুতরাং এই জাগ্রত আন্তর্জাতিক বিবেকের সম্মুখে যে হঠাৎ কোন নিরপরাধ এবং অস্ত্রবর্জনকারী রাষ্ট্র কোন ক্ষমতালোলুপ

শক্তি দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হবে—এমন আশঙ্কা করার কারণ নেই। দুটি মারাত্মক বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনের মাঝখানে থেকেও নিরস্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের গায়ে যে আঁচ লাগে নি, সে এই কারণে।

পাকিস্তান ও চীনের সমস্যা

অবিশ্বাসী তবু বলতে পারেন: বেশ, অহিংস রক্ষা ব্যবস্থার সপক্ষে এ সব যুক্তিতর্ক না হয় অকাট্য কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা এবং চীনের আক্রমণের প্রতিকারের কোন উপায় অহিংসপন্থীরা দেখাতে পারেন কি? এ সন্দেহের ভিত্তি আছে। সুতরাং এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা অনুচিত হবে না। গান্ধীজী স্বয়ং সৈন্যবাহিনী দ্বারা কাশ্মীর রক্ষা করার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন – এই যুক্তিতে অহিংসা-পন্থীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিনোবাজী এর যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিস্থিতিতে গান্ধীজী এর সমর্থন করেছিলেন, আজ তার আমুল পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তাই গান্ধীজীর ঐ সমর্থন "আউট অফ ডেট" বা কালপ্রভাবে প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। অহিংসার দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মীর সম্বন্ধে নিম্নরূপ নিদান দেওয়া চলে। সর্বপ্রথম ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য কোন নিরপেক্ষ এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে কাশ্মীরবাসীর অভিমত যাচাই করা উচিত যে তাঁরা ভারতবর্ষেই থাকতে চান, না পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক অথবা তৃতীয় কোন ব্যবস্থা চান। সমগ্র কাশ্মীর বা তার অংশ বিশেষের অধিবাসী ভারতবর্ষে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরও যদি পাকিস্তান সেই এলাকার উপর তার আক্রমণমূলক কার্যকলাপ বন্ধ না করে, তা হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সীমান্তে অহিংস শান্তিসৈনিক পাঠানো দরকার—যাঁরা প্রাণ দিয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করবেন। কাশ্মীরবাসী ভারতবর্ষে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করার পর ভারতের সপক্ষে বিশ্বের নৈতিক সমর্থনের সমাবেশ হবে এবং শান্তিসৈনিকেরা প্রাণের বিনিময়ে আক্রমণকারীদের হৃদয় পরিবর্তন করার প্রয়াস করবেন। এই

দ্বিবিধ নৈতিক শক্তির কাছে বিশ্বের দুর্ধর্ষতম আক্রমণকারীকেও নতি স্বীকার করতে হবে। অহিংসার দৃষ্টিকোণ থেকে এইভাবে ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শান্তিসৈনিক সংগঠন করে পাঠানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শংকররাও দেওজীর একটি সময়োচিত প্রস্তাব (হিন্দী 'ভূদানযজ্ঞ', তেসরা মার্চ, ১৯৬১) খুবই বিবেচ্য। তাঁর মতে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য কেবল নিগৃহীত দেশের শান্তি সৈনিক নয়, বিভিন্ন দেশীয় শান্তি সৈনিকদের দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সেনাবাহিনীর নিয়োগ প্রয়োজন।

শান্তিসেনার ভূমিকা

সম্প্রতি বিনোবাজী যে শান্তিসেনা সংগঠনের উপর জোর দিয়েছেন তা অতীব সময়োপযোগী। কারণ সহিংসপন্থায় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার যে প্রচলিত ব্যবস্থা, তার বিকল্প কোন অহিংস ব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা না যায় তা হলে অহিংস সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা কল্পনাবিলাস মাত্র। শান্তি সৈনিকের কার্যকলাপ দ্বারা জনসাধারণের মনে যখন এই আস্থা জাগবে যে অহিংস পদ্ধতিতেও শান্তিরক্ষা ও দেশ রক্ষা করা যায়, তখনই কেবল তারা অহিংস সমাজব্যবস্থার জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে অগ্রসর হবে। গান্ধীগ্রামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ প্রতিরোধকারীদের সম্মেলনে (ডিসেম্বর ১৯৬০) যে আন্তর্জাতিক শান্তিসেনা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা-ও একটি সঠিক পদক্ষেপ।

দেশরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা জেনে রাখা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কারও ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, পৃথিবী ক্রমশঃ এক পরিবারের রূপ ধারণ করছে। এই পরিবারের কোন সদস্য সৎকাজ করলে যেমন তজ্জনিত কল্যাণের ভাগীদার সকলে হবে, তেমনি কেউ সাময়িক বিকার বশতঃ অন্যায় কাজ করলে আর সকলকে তার জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হবে। অন্যায় করার জন্য পরিবারের কোন সদস্যের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে

দেওয়া সম্ভব বা সমীচীন নয়। অতএব কচিৎ কখনও পররাজ্য আক্রমণের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সহিংস-পন্থায় তার প্রতিরোধ করতে গেলেও ধনক্ষয় ও জনবিনাশ অপরিহার্য। অহিংস প্রতিরোধে কেবল এর পরিমাণ কম হবে এবং অন্যায়কারীর হৃদয় পরিবর্তন করে তাকে ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনাও দ্রুততর হবে। এই জন্যই আলডুস্ হাক্সলে অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে বলেছেন, "হিংসা বা অন্য যে কোন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ হোক না কেন, সত্যাগ্রহের চেয়ে তাতে অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। নিতান্ত নির্মম এবং খামখেয়ালী বিপক্ষের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও সুশৃঙ্খল ভাবে কষ্ট সহ্য করা এবং এমন কি স্বেচ্ছায় আত্মনিগ্রহ বরণ করার নীতি সহ থোরো-কথিত 'আইন অমান্য আন্দোলন' আপাতদৃষ্টিতে ফলদায়ক বলে প্রতীয়মান না হলেও অসহ্য অত্যাচারের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বা বৃথা এর সশস্ত্র প্রতিরোধ করার চেয়ে বস্তুতঃ এর ফল কিছু খারাপ হবে না। বরং মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে সব দিক থেকে এর ফল অনেক ভাল হবে। যাঁরা সত্যাগ্রহে যোগদান করবেন, যাঁরা এই অহিংস প্রতিরোধের দৃশ্য দেখবেন এবং অপরের কাছ থেকে যাঁরা এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনবেন, এঁদের সকলের পক্ষেই এ পদ্ধতি (সত্যাগ্রহ) হবে অধিকতর মঙ্গলজনক।"

গ্রন্থপঞ্জী

The Power of Non-violence	রিচার্ড গ্রেগ
Defence in the Neuclear Age	কম্যাণ্ডার স্টিফেন কিং-হল
Deterrent or Defence—A Fresh Look at the West's Military Position	ক্যাপ্টেন বি .এইচ. লিডল-হার্ট
Commonsense and Neuclear War	বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল
The Quiet Battle	মালকোর্ড সিবলে
শান্তিসেনা (হিন্দী)	বিনোবা ভাবে

॥ ১০ ॥

ক্ষমতার সমস্যা

সর্বোদয়ের অনুসারী রাজনৈতিক ও আর্থিক কাঠামো কোন মতে একবার খাড়া করতে পারলেই তারপর আর কোন সমস্যা থাকবে না—এ জাতীয় সমস্যার অতি-সরলীকরণের মনোবৃত্তির পরিপোষকতা করা দূরদৃষ্টির লক্ষণ নয়। কমিউনিজম বা অন্যবিধ মানবকল্যাণকামী আদর্শের মত সর্বোদয়ের ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকী আছে এবং তা হল বিপ্লবোত্তর মূল্যবোধ অনুসারে নূতন যুগের নেতৃবৃন্দ চলবেন—এর নিশ্চয়তা কি? রাজনৈতিক প্রশ্নটি power বা ক্ষমতার। ক্ষমতার লোভ (love of power) মানুষের এক সহজ ও সনাতন বৃত্তি। সুষ্ঠু পারিবারিক গোষ্ঠী ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য এর সম্যক্ অস্তিত্ব যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ অপর যে কোন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার মত সর্বোদয় সমাজকেও বিকৃত করে ফেলতে পারে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সর্বোদয়ের প্রবক্তারাও মানুষ এবং তাই ক্ষমতার লোভ রূপী মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে তাঁরা কেউ নন। সর্বোদয়ের আদর্শে আর্থিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যথাসম্ভব অধিক মাত্রায় বিকেন্দ্রিত হবে বলে ক্ষমতার এই সমস্যা সেখানে যথাসম্ভব কম উগ্র হবে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারে ক্ষতির পরিমাণ ও বিস্তৃতিও হবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প। তবু মানবস্বভাবের কারণে সমস্যার বীজ থেকেই যাবে। সুতরাং অতীব দুরূহ হলেও এ সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন।

ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার কথা (taming of power) সনাতন কাল থেকেই মানুষ চিন্তা করে এসেছে। প্লেটোর "দার্শনিক রাজা" ইত্যাদি এরও দ্যোতক। সাম্প্রতিক কালে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তারা ভেবেছিলেন যে সার্বজনীন ভোটের অধিকার অপ্রতিহত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। কিন্তু প্রধানতঃ আর্থিক ক্ষেত্রে

অবাধ স্বাতন্ত্র্যের নীতি সম্বন্ধে নীরব থাকায় সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের আশা পূর্ণ হয় নি। সাম্যবাদ অন্যভাবে এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছিল এবং সেখানে যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতার রাষ্ট্রীয়করণ করে এবং সে রাষ্ট্রের কর্ণধার সর্বহারাদের পার্টিকে করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা এক প্রচণ্ড স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে যার কাছে হিটলার মুসোলিনীর স্বৈরতন্ত্রও কিছু নয়। এতদুভয়ের মধ্যপন্থী সর্বোদয়ে রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল এই দুটি রক্ষাকবচ যথেষ্ট নয়। কারণ পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমতার লোভের মূল মানুষের সহজ বৃত্তিতে (instinct) প্রোথিত।

সর্বোদয় সমাজ যদি এক আদর্শ ব্যবস্থা হয় তা হলে নিঃসন্দেহে আদর্শবাদী মানসিকতা ব্যতিরেকে এর সম্যক্ রূপায়ণ সম্ভবপর নয়। প্রথমে আর কেউ যদি না-ই আসে তবু এর প্রবক্তাদের অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আদর্শবাদের আকর্ষণেই বিপ্লবোত্তর মূল্যবোধের অনুসারী হতে হবে। কিন্তু কিসের টানে? স্বভাবতঃই ধর্মের আকর্ষণে। এ ধর্ম কোন পন্থ, শাস্ত্র বা গুরু-পয়গম্বরের সাম্প্রদায়িক (sectarian) ধর্ম নয়। এ হল ব্যাপক অর্থে ধর্ম। ড. রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় যাকে বলে "এ ধর্ম কোন অন্ধবিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য অথবা কোন নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করা নয়। ধর্ম বলতে বোঝায় সত্য, প্রেম ও ন্যায়বিচারের পরম মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ঐ সব মূল্যবোধকে এই ধরাতলে মূর্ত করার অবিরাম প্রয়াস।" (বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, গান্ধী মেমোরিয়াল পিস নাম্বার, পৃ. ২০৭)

এই মহাজাগতিক ধর্মের প্রভাবে মানুষের ক্ষমতার লোভ রূপী সহজ বৃত্তির নিয়মন হওয়া সম্ভব। কারণ এই ধর্ম মানুষকে অনাসক্ত এবং বহু ক্ষুদ্র বিষয়ে নিস্পৃহ করে তোলার শক্তি রাখে।

মূলতঃ রাজনীতি-বিজ্ঞানের এই আলোচনায় ধর্মের অবতারণা কারও কারও কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার

সমস্যা সমাধানের জন্য যে এক অমোঘ পন্থা বার্টর‍্যাণ্ড রাসেলের মত কট্টর নাস্তিক্যবাদীও সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর 'Power—A New Social Analysis' গ্রন্থে এই taming of power বা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "কিন্তু কেবল বুদ্ধি, প্রজ্ঞা নয়। বুদ্ধি পরিচালনা ও পথনির্দেশ করতে পারে কিন্তু যে শক্তি কর্মে প্রবৃত্ত করে তার সৃষ্টি করতে পারে না। এই শক্তির জন্ম আবেগ থেকে। তবে যেসব আবেগের পরিণামে বাঞ্ছনীয় সামাজিক পরিণতি জন্মায় সেগুলি ঘৃণা ক্রোধ ও ভয়ের মত সহজে সৃষ্টি হয় না। এদের সৃষ্টি অনেকাংশে প্রথম শৈশব এবং বহুলাংশে আর্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য সাধারণ শিক্ষা-প্রক্রিয়াতেও কিছুটা করা যায় যার ফলে শ্রেয়তর আবেগের জন্মের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং মানবজীবনে যাতে মূল্যবোধের সঞ্চার হতে পারে তার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

"অতীতে ধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই।" (ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৩১৫-১৬)।

গোঁড়ামি বর্জিত মনোভাব নিয়ে ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ক্ষমতার কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অসাম্প্রদায়িক ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

রাসেল অবশ্য ধর্ম ছাড়া আরও অনেক উপায়ে ক্ষমতার সমস্যার সমাধানের কথা বলেছেন এবং এ প্রসঙ্গে সে সবগুলির কথাই স্মরণীয়। তিনি বলছেন :

"(এ ব্যাপারে) যাঁদের পক্ষে আর সনাতন ধর্মের সহায়তা নেওয়া সম্ভবপর নয় তাঁদের জন্য অন্য অনেক উপায় আছে। নিজের যা চাই অনেকে তা সংগীতে পান, কেউ কেউ পান কাব্যে। অনেকের কাছে আবার জ্যোতিষ (astronomy) সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। নক্ষত্র-জগতের আকার ও বয়সের কথা আমরা যখন চিন্তা করি তখন এই অকিঞ্চিৎকর গ্রহে আমরা যে সব তর্ক-বিতর্ক করি তার গুরুত্ব অনেকটা কমে যায় এবং আমাদের বিবাদ-বিসংবাদের

তীব্রতা বহুলাংশে তুচ্ছ হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হয়।" (সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১৬)

বলা বাহুল্য, চারুশিল্প অথবা জ্যোতিষের ভূমিকা এখানে ধর্মের সেই অনাসক্তি বা নিস্পৃহতা সৃষ্টিরই উদ্দেশ্যে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মায়ের ২৫-৪-১৯৫৪ সনের একটি ঘোষণা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন এবং তাঁর আশ্রমের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল এর সদস্যদের সব রকমের রাজনীতির সংস্রব বর্জন করতে হবে। এর কারণ এই নয় যে শ্রীঅরবিন্দ পার্থিব ঘটনাবলী সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন। এর আসল কারণ হল এই যে, আজ হীন ও কুৎসিৎভাবে রাজনীতি করা হয়। তার ফলে এই ক্ষেত্র পূর্ণ মাত্রায় মিথ্যাচার, প্রতারণা, অবিচার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও হিংসা দ্বারা পরিকীর্ণ। কারণ হল এই যে, রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য মানুষকে ভণ্ডামি কপটতা ও অসাধু আকাঙ্ক্ষার অনুশীলন করতে হয়।" সেই একই সমস্যা! এর সমাধান স্বরূপ শ্রীঅরবিন্দের অনুগামিনী মা যোগের পন্থা নির্দেশ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দ কথিত যোগের পরিণামও আমরা যে সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছি প্রকারান্তরে তারই অনুরূপ। ঐ ঘোষণাতেই মা বলছেন, "আপনাদের যোগের অপরিহার্য ভিত্তি হল আন্তরিকতা, সততা, নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্য কর্মের প্রতি অনাসক্ত আত্মোৎসর্গ, মহৎ চরিত্র এবং ঋজু স্বভাব।" অর্থাৎ কেবল বাহ্য কাঠামোকে আদর্শ করাই যথেষ্ট নয়— এই কাঠামোর সঞ্চালক মানবমনেরও সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন এবং এর ভিত্তি হল ক্ষুদ্র অহম্-এর উর্ধ্বে ওঠার অনাসক্তির প্রক্রিয়া।

গান্ধীজী যে রাজনীতিকে (অর্থাৎ ক্ষমতা প্রাপ্তি ও সঞ্চালনের institution বা মাধ্যমকে) spiritualise বা আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করার কথা বলতেন এবারে তার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে। গান্ধীজী ঘোষণা করেছেন, "কোন কোন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, রাজনীতি ও ঐহিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার কোন স্থান নেই। আমি এর সঙ্গে

সহমত নই, ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য আমার সত্য ও অহিংসার প্রয়োজন নেই, এই দুই নীতিকে দৈনন্দিন জীবনে প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতেই সর্বদা আমি চেষ্টা করেছি।" (সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী, ১৩১)

রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের আমদানী করার জন্য পল্লবগ্রাহী সমালোচকেরা গান্ধীজীর প্রতি মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার অপবাদ দিয়েছেন। কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা অন্ধ গোঁড়ামি গান্ধীজীর উপাস্য ছিল না। রাজনীতিতে যে ধর্মের প্রবর্তন গান্ধীজী চেয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই তিনি বলেছেন,…"এখনও আমার অভিমত এই যে, রাজনীতিকে আমি ধর্মের সম্পর্কবিরহিত অবস্থায় কল্পনা করতে পারি না। বস্তুতঃ আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপই ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত। এখানে ধর্মের অর্থ সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। এর অর্থ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা সুশৃঙ্খল নৈতিক বিধানের প্রতি বিশ্বাস। চোখে দেখা না গেলেও এটা কম বাস্তব নয়। এ ধর্ম হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় মতবাদের উর্ধ্বে।" (সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী, ৭২৪)।

গ্রন্থপঞ্জী

Power—A New Social Analysis	বারট্রাণ্ড রাসেল
আমার ধর্ম	মো. ক. গান্ধী
Selections from Gandhi	নির্মলকুমার বসু

॥ ১১ ॥

উপসংহার

শাসনমুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যম হিসাবে সর্বোদয়ের ভূমিকা সম্বন্ধীয় এই আলোচনায় চিরায়ত রাজনীতি-বিজ্ঞানের সুধী পাঠক হয়তো একটা ফাঁকের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারেন। সর্বোদয় সম্বন্ধীয় আলোচনা কোন বিধিবদ্ধ মতবাদের আকারে উপস্থাপিত করা হয় নি এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সব রকমের প্রশ্নের পর্যালোচনাও করা হয় নি। আধুনিক পাঠকের কাছে এই ফাঁক তাই সর্বোদয়ের হেত্বাভাস (fallacy) মনে হতে পারে। সুতরাং এর একটু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন।

ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বোদয় বিচারের প্রবর্তক গান্ধীজীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি এর একটি মূল কারণ। দ্বিতীয় এবং সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই, সর্বোদয় এ বিষয়ে কোন "শেষ সত্য" বা "চূড়ান্ত কথার" নীতিতে আস্থাশীল নয়। আদর্শ বিজ্ঞানীর মত সর্বোদয় ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জ্ঞান অর্জন করতে করতে এক সত্য থেকে আর এক সত্যে উপনীত হবার সাধনায় বিশ্বাসী। পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের মত ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন বিজ্ঞানী কোন বিষয়ে শেষ কথা বলার স্পর্ধা প্রকাশ করেন না। কোপার্নিকাসের পর গ্যালিলিও এবং তারপর নিউটন ও আইনস্টাইনের সাধনায় বস্তুসত্য শতদলের মত স্তরে স্তরে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সাধকের আবিষ্কার পূর্বসূরীর চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানসাধক যিনি, তিনি কেবল বিজ্ঞানের মূল নীতিনিষ্ঠ হয়ে সমসাময়িক কালের জ্ঞানের আলোকে সত্যানুসন্ধান করেন।

ভৌতিক বিজ্ঞান সমূহ সম্বন্ধে যদি এই কথা প্রযোজ্য হয়, তা হলে রাজনীতি বিজ্ঞানের মত বিমূর্ত (abstract) শাস্ত্র সম্বন্ধে এ

পদ্ধতি আরও কত সত্য! অতএব সর্বোদয় দর্শনের আপাত-অপূর্ণতা তার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণেরই পরিচায়ক। সত্য এবং অহিংসা—এই দুই মূল নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে খুঁটিনাটির ব্যাপারে সর্বোদয় সর্বদাই স্থান কাল ও পাত্রোপযোগী ব্যবস্থাপিতকরণে (adjustment) প্রস্তুত। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সর্বোদয় বিচারের গোঁড়ামি বিবর্জিত চারিত্র-ধর্মের নিদর্শন মেলে এবং সর্বোদয়ের শক্তির মূল উৎসও এইখানে।

॥ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তকের ভূমিকা এবং মূল রচনার ভিতর ও প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যে সব পুস্তকের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আরও জানার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে।

	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার
১.	Democratic Socialism	অশোক মেহতা
২.	Guide to Socialist Thought	জি. ডি. এইচ. কোল
৩.	Politics of Charkha	আচার্য কৃপালনী
৪.	Class Struggle	„ „
৫.	সর্বোদয় দর্শন (হিন্দী)	দাদা ধর্মাধিকারী
৬.	গান্ধীজি কি চান	নির্মলকুমার বসু
৭.	Studies in Gandhism	„ „
৮.	গান্ধী ও মার্কস	কিশোরলাল মশরুওয়ালা
৯.	Which Way Lies Hope ?	রিচার্ড বি. গ্রেগ
১০.	আমার ধ্যানের ভারত	মহাত্মা গান্ধী
১১.	Sarvodaya	„ „
১২.	Selections from Gandhi	„ „
১৩.	The Life and Teaching of Karl Marx	ম্যাক্স বীয়র
১৪.	গান্ধীবাদের পুনর্বিচার	এম. এল. দাঁতওয়ালা
১৫.	গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনা	শ্রীমন্ নারায়ণ
১৬.	বিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও শান্তি	আলডুস হাক্সলে
১৭.	An Intelligent Woman's Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism and Fascism	বার্ণার্ড শ'
১৮.	The Managerial Revolution	জেমস বার্ণহাম

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার
১৯. The Community of the Future and the Future of the Community	আর্থার ই. মরগ্যান
২০. Towards Non-violent Socialism	মহাত্মা গান্ধী
২১. Socialism of My Conception	
২২. Saga of Satyagraha	আর. আর. দিবাকর
২৩. Sarvodaya After Gandhi	বিশ্বনাথ ট্যাণ্ডন

গ্রন্থকারের পুস্তক-সূচী

অনুবাদ

মহাত্মা গান্ধীর	আমার ধ্যানের ভারত (চতুর্থ সংস্করণ)
„ „	ছাত্রদের প্রতি (তৃতীয় সংস্করণ)
„ „	শিক্ষা (তৃতীয় সংস্করণ)
„ „	আমার ধর্ম
„ „	আমার জীবন কাহিনী
„ „	পল্লী পুনর্গঠন (দ্বিতীয় সংস্করণ)
„ „	সত্যাগ্রহ
আইনস্টাইনের	জীবন-জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
আলডুস হাক্সলের	বিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও শান্তি
	এণ্ড এ্যাণ্ড এসেন্স
কিশোরলাল মশরুওয়ালার	গান্ধী ও মার্কস

সম্পাদনা

M. K. Gandhi	My Non-violence
Albert Einstein	My Views
শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি	গান্ধী-পরিক্রমা

মৌলিক রচনা

গান্ধীজীর গঠনকর্ম

সত্যাগ্রহের কথা